চোরা লণ্ঠনের আলো এবং

চোরা লণ্ঠনের আলো এবং

অংশুমান বসু

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক

শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী

ব্যানার্জী পাবলিসার্স

৫/১এ, কলেজ রো

কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৬৪

মুদ্রাকর

শ্রীঅবনীরঞ্জনমান্না

নিউ মহামায়া প্রেস

৬৫।৭ কলেজ স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

শর্মিষ্ঠা (সোমা)

ও

শিবাশিসকে

লেখকের অন্যান্য বই

গল্প ও উপন্যাস

সূর্য তিয়াষ

চতুর্দশী

যোদ্ধা

সরস্বতীর কমল বনে

ছোটদের গল্প

ছোটদের হরেক গল্প

বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প

বিজ্ঞান নিয়ে গল্প

বিজ্ঞান নিয়ে হরেক গল্প

বিজ্ঞানের নানা গল্প

বিজ্ঞান নিয়ে আরও গল্প

পরমাণুর দৈত্য

বিকল্প শক্তির খোঁজে

বিজ্ঞান নিয়ে নতুন গল্প

বিজ্ঞানের গল্প

অর্থনীতি

* ভারতের গ্রামোন্নয়ন পর্যালোচনা
* পরিকল্পনা ও বিকেন্দ্রীকরণ
* উন্নয়নের অর্থনীতি

কৃষিকথার আসর

টাকা—আনা-পাই

* যুগ্ম লেখক

গল্পক্রম

চোরা লণ্ঠনের আলো

ঝমঝম করে ছুটে চলেছে রাজধানী-গামী সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস। ছোটা শুরু করেছে সকাল নটায়। বেশি জায়গায় এ ট্রেনের থামার কথা নয়। তাই রাজধানী পৌঁছনোটা একটা দিন ও রাতের মামলা শুধু।

আমার সহযাত্রিণী একজন বয়স্কা মহিলা। ওঁকে বৃদ্ধাই বলা যায়। না বললেও প্রৌঢ়ত্বের অস্পষ্ট গণ্ডিরেখা পার হতে মনে হয় ওঁর খুব বেশি দেরি নেই। তবে তার মুখে একটা স্বাতন্ত্রের ছাপ স্পষ্ট। ফর্সা রং, ভরাট চেহারা। সঙ্গে কম বয়সী একটি ছেলে। ওঁর নাতি মৃণাল। থ্রি টায়ার শ্লিপার কামরার একই বক্সের যাত্রী আমরা। আমার বার্থের বিপরীত দিকেই ওঁদের আসন।

হাওড়া থেকে এক দৌড়ে আসানসোল স্টেশনে ট্রেন থামলে মৃণাল একটি ইনল্যান্ড চিঠি হাতে প্ল্যাটফর্মে নেমে গেল। সম্ভবত হাতের চিঠিটি পোস্ট করতে। হাওড়ার ডাকবাক্সে চিঠি ফেলার সময় পায়নি হয়তো। ট্রেন ছাড়ার বেশ আগে সে ফিরে এল। পরের স্টেশন ধানবাদ। এখানে ট্রেন থামতে মৃণাল আবার একটি ইনল্যান্ড হাতে নেমে গেল এবং ফিরে এল শূন্য হাতে। এর অর্থ এখানেও একটি চিঠির ডাকবাক্সপ্রাপ্তি হয়েছে। পরে কোন স্টেশনে ট্রেন থামবে জানি না। হয়তো গয়া। তখনও বেশ দিনের আলো থাকবে। হাতেধরা বইটা খুলে বসলাম আমি।

একটা স্টেশন গেল। ঘরবাড়ি কাঁপানো ঝমঝম শব্দ উঠতে লাগল। কোনও মাঝারি স্টেশন হবে। কোন স্টেশন দেখতে চোখ তুলেছি, সুপারফাস্ট ট্রেনের দুরন্ত গতি স্টেশনের নাম পড়তে দিল না। নজর ঘুরিয়ে আনতে গিয়ে চোখে পড়ল বয়স্কা মহিলাটির কোলের ওপর রাখা একটি পাতা—না—খোলা সাময়িক পত্রিকা। সাময়িক পত্রের ওপর একটি খোলা ইনল্যান্ড লেটার। তার এক প্রান্তে মহিলাটির বাঁ হাত আলতো করে রাখা। ওঁর অন্য হাতে কলম। উনি মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছেন। কী দেখছেন উনি? আকাশ। দিগন্ত বিস্তারী ফসলহীন মাঠ ছাড়া ছাড়া গাছপালা অথবা দূরান্তের অস্পষ্ট পাহাড়ের রেখা! যখন মহিলাটি তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন, আমি সে দৃষ্টিতে জীবনের প্রতি আসক্তির কোনও চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। মনে হল ওঁর চোখের তারায় বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অভিমানও যেন জমে আছে। আমার দেখায় ত্রুটি আছে নিশ্চয়। আমি হাতের বইটাতে মন দেবার চেষ্টা করলাম।

চোখের সামনে বইটা খোলা থাকলেও আমি ওতে অবশ্য ঠিক মন দিতে ট্রেনের ঝাঁকানিতেও পারছিলাম না। মাঝেমাঝেই ভদ্রমহিলার কোলের ওপর রাখা খোলা অন্তর্দেশীয় পত্রের ওপর আমার চোখ চলে যাচ্ছিল। ট্রেনের ঝাঁকানিতেও প্রৌঢ়া মহিলাটি কী সব যেন লিখে চলেছেন। এক সময় লেখা শেষ হলে ইনল্যান্ড বন্ধ করে ঠিকানা লিখলেন। তারপর নিজের হাতব্যাগ থেকে ফেবিকুইক জাতীয় কোনও কিছু বার করে পত্রের মুখ আটকালেন। কাজ সারা হলে বসে থাকলেন একান্ত উদাসীনের মতো। বাইরে এতক্ষণে ধীর ছন্দে দিনের জাল গোটানো শুরু হয়েছে। মহিলাটি সেদিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্না হলেন সম্ভবত।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ট্রেনের গতি কমে এল। ভদ্রমহিলা মৃণালকে কী যেন জিজ্ঞাসা করলেন। ছেলেটি মাথা নাড়ল। আমার দিকে তাকিয়ে বড় বড় বিষণ্ণ চোখ দুটি তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও জংশন স্টেশন আসছে কি? ট্রেন কি এখানে দাঁড়াবে?

—এবার বোধহয় গয়া আসছে। এখানে গাড়ি সম্ভবত খুব অল্প সময়ের জন্য দাঁড়াবে। আমি জানালাম।

গয়া এলে মৃণাল ইনল্যান্ডটি হাতে নিয়ে নামতে যাচ্ছিল, ওর দিদা ওকে বারণ করলেন। তিনি গলা বাড়িয়ে একটি চাঅলাকে ডাকেন। কী কথা হল তার সঙ্গে। হাত বাড়িয়ে দু ভাঁড় চা নেবার পর প্রৌঢ়া মহিলাটি চাঅলার হাতে ইনল্যান্ডটি দিয়ে দিলেন। নিশ্চয় চিঠিটি চাঅলাই পোস্ট করে দেবে।

আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিল। ভদ্রমহিলা কাদের এত চিঠি লিখছেন। আত্মীয়-স্বজনকে নাকি পাড়া-প্রতিবেশীকে! উনি কি ট্রেন জার্নির পুরো সময়টাই নানা জনকে চিঠি লিখে কাটাবেন? নিশ্চয় চিঠি লেখা ওঁর নেশা। এতে তিনি মজা পান সম্ভবত। সময়ও বেশ কেটে যায়। আর তাই হয়তো শুধু চিঠি লিখেই ক্ষান্তি দিচ্ছেন না, স্টেশনে ট্রেন থামলেই সে সব চিঠি পোষ্ট করিয়েও ছাড়ছেন। সম্ভবত যাদের চিঠি লিখছেন, তাদের কাছে তাড়াতাড়ি চিঠি পৌছে দিয়ে 'সারপ্রাইজ'ও দিতে চাইছেন। মনে মনে আমি দারুণ কৌতূহলী হয়ে পড়ছিলাম।

কৌতূহল আরও বাড়ল মুঘলসরাই-এ পৌঁছবার পর। আমি প্ল্যাটফর্মে নামছিলাম রাতের খাবারের সন্ধানে। গরম গরম কিছু পুরি-তরকারি আমার আপাত লক্ষ্য। ভদ্রমহিলা আমাকে ডাকলেন।—আপনি তো গাড়ি থেকে নামছেন, কষ্ট করে এই চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে দিতে পারবেন কি?

আমার আপত্তি করার কোনও কারণ ছিল না। বরং কৌতূহল মেটাবার একটা সুযোগ পেলাম। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে ওঁর হাত থেকে ইনল্যান্ডটি নিয়ে নিলাম। কিন্তু এই চিঠিটা উনি কখন লিখলেন? আমি তো প্রায় সারাক্ষণই ওঁর দিকে নজর রাখছি। অবশ্য একবার উঠে ভেস্টিবিউলে কটা কামরা পার হয়ে আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে গিয়েছিলাম। তখন বেশ খানিকটা সময় ওখানে কাটিয়ে এসেছি। নিশ্চয় এই সময়টাতেই বয়স্কা মহিলাটি তাঁর চতুর্থ ইনল্যান্ডটিকে কাজে লাগিয়েছেন।

প্ল্যাটফর্মে নেমেই চিঠির ঠিকানায় চোখ বোলালাম। কাঁপা কাঁপা হাতে গোটা গোটা অক্ষরে ইংরাজিতে কোনও এক অদ্বৈত বসু মল্লিকের নাম লেখা। ঠিকানা

দেখলাম—নীলকুঠিড়াঙ্গা, পুরুলিয়া।

রাতের খাবার শেষ হতেই সবাই শোবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমার তক্ষুনি শোবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সহযাত্রীদের তাগাদায় অন্য রাস্তাও ছিল না। প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা আমার বিপরীত সারির লোয়ার বার্থে চাদর বিছিয়ে শুয়ে। মৃণাল মাঝেরটায়। শরীরটা ক্লান্ত ছিল বেশ। তার ওপর ট্রেনের দোলা। তাই শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙ্গল অনেক রাতে। মৃণাল এবং অন্য যাত্রীরা তখন ঘুমিয়ে কাদা। গাড়ির গতিও এ সময় কমে আসছে। সামনে কোনও বড় স্টেশন আসছে নিশ্চয়। কয়েক মিনিট পরে মুখ বাড়িয়ে দেখি এলাহাবাদে ট্রেন ঢুকছে। আমার জলের বোতলটা খাবার সময়ই খালি হয়ে গেছিল। অনেক আগে থেকেই তেষ্টা পাচ্ছিল খুব। জল খাওয়া দরকার। খালি বোতলটা নিয়ে নামতে যাচ্ছি, প্রবীণা মহিলা ডাকলেন—আপনি তো নামছেন। একটু কষ্ট করে চিঠিটা আর. এম. এসে দিয়ে দিতে পারবেন?

আমি চিঠিটা নিলাম। এবার আর অবাক হইনি। ভদ্রমহিলার বিচিত্র স্বভাবের সঙ্গে আমি ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়ে গেছি।

প্ল্যাটফর্মে নেমে চিঠির ঠিকানায় চোখ পড়ল। একী! প্রাপকের নাম তো সেই অদ্বৈত বসু মল্লিক। ঠিকানা অবশ্য আলাদা। নীলম রোড, মুঙ্গের, বিহার। আমার বিস্ময় বাড়ল, কজন অদ্বৈত বসু মল্লিক আছেন যাঁরা ভদ্রমহিলার জানা-চেনা অথবা আত্মীয় বা বন্ধু!

এলাহাবাদের পরে সুপারফাস্ট দেরি করতে লাগল। আগে কোথায় নাকি একটা ডিরেলমেন্ট হয়েছে। কানপুরে পৌঁছতে বেশ বেলা। মৃণাল হাতে একখানি নয়, দুখানি ইনল্যান্ড পত্র নিয়ে নামতে যাচ্ছে দেখে আমি ওর পিছু নিলাম। প্ল্যাটফর্মে একটু এগিয়ে ওকে ডাকি। আমার ডাক শুনে মৃণাল ঘুরে দাঁড়াল।

—তুমি চিঠি পোস্ট করতে যাচ্ছ তো?

মৃণাল সলজ্জ হাসল।

—আমাকে দাও, আমি আর. এম. এসের দিকেই যাচ্ছি।

মৃণালের হাত থেকে চিঠি দুটি নিয়ে প্রাপকের নামে চোখ বোলাতেই প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। এই দুটি চিঠিও জনৈক অদ্বৈত বসু মল্লিকের উদ্দেশ্যে লেখা। ঠিকানা আলাদা আলাদা। একটির গন্তব্য হজরতগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ এবং অন্যটির ঠিকানা কৃষ্ণকুঞ্জ, নন্দগাঁও, মথুরা। আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে মৃণালের হাত ধরে বললাম, মৃণাল, এই অদ্বৈত বসু মল্লিকটি কে? তোমার দিদিমার সব কটি চিঠিই কি এই ভদ্রলোকের কাছে লেখা?

মৃণালের মুখে বিচিত্র ভাব ফোটে। আমি তাগিদ দিতে ও গাল ছড়িয়ে হাসল। —অদ্বৈত বসু মল্লিক আমার দাদুর নাম।

মৃণালের কথায় আমি হতভম্ব হয়ে যাই। —অদ্বৈত বসু মল্লিক তোমার দাদু! তিনি কোথায় আছেন এখন? কী করেন? তাঁর কি কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই? তোমার দিদা তাঁকে বিভিন্ন ঠিকানায় চিঠি দিয়ে যাচ্ছেন কেন?

আমার এতগুলো প্রশ্নে মৃণাল করুণ মুখে হাসল।—ঠিকই ধরেছেন আপনি। দাদু কোথায় যে এখন আছেন তা দিদা কেন, বাড়িতে কেউ জানে না। নানা ঠিকানায়

দিদা নিজের মনেই চিঠি দিয়ে যাচ্ছেন।

—কিন্তু কেন? সাধারণত এমনটা হয় না। কিছু একটা ঘটনা হয়েছে বুঝতে পারছি। তুমি ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলো, মৃণাল। জানতে বড্ড কৌতূহল হচ্ছে বুঝতেই পারছ।

মৃণাল নিরুত্তর। আমি ওকে তাড়া দিই। —বল মৃণাল, দেরি কোরো না। দেরি হলে ওদিকে তোমার দিদা ভাববেন।

আমার কথায় কাজ হল। মৃণাল ধীরে ধীরে বলতে থাকে, আমার দাদু দু-বছরের বেশি হল কাউকে কিছু না বলে বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন কেউ জানে না। এত দিন হল, আজ পর্যন্ত কাউকে একখানাও চিঠি দেননি।

—ওঁর কোনও বিপদ-টিপদ হয়নি তো? তোমরা ভাল করে খবরাখবর নিয়েছ?

—ওনার কোনও বিপদ হয়নি। দাদুর এক বন্ধুই চিঠি দিয়ে একথা জানিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে দাদুর কিছুদিন আগেই দেখা হয়েছিল।

—কিন্তু তোমার দাদু হঠাৎ এমন ভাবে চলে গেলেন কেন? সন্ন্যাসী-টন্নাসি হয়ে গেছেন নাকি?

—জানিনা। বাড়ি ছাড়ার সময় দাদু একটা ছোট চিঠি লিখে গিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, ওঁর খোঁজ যেন কেউ না করে।

—তার মানে উনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন। কিন্তু কেন নিরুদ্দেশের সিদ্ধান্ত এই বয়সে নিতে গেলেন উনি? তুমি কিছু জানো, মৃণাল?

মৃণালকে বেশ ম্রিয়মান লাগে। —আমি ঠিক জানি না। তবে মনে হয় দিদার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হওয়াতেই উনি বাড়ি ছেড়েছেন।

—হঠাৎ ঝগড়া হয়েছিল কি? এমনিতে ওঁদের সম্পর্ক কেমন থাকত?

—খুব ভালো বোধহয় ছিল না। বিশেষ করে শেষের দিকে। দুজনের মধ্যে প্রায়ই খিটিমিটি লেগে থাকত। কথা কাটাকাটিও হত অনেক দিন। আসলে আমার দিদা খুব জেদী স্বভাবের, উনি একবার যা বলবেন তাই সবাইকে মেনে নিতে হবে। দাদুকেও। না মানলেই অশান্তি। চেঁচামেচি করতেন খুব। অনেক সময় রাগের চোটে হাতের কাছে যা কিছু পেতেন, তাই ছুঁড়ে ফেলতেন। খাওয়া-দাওয়াও বন্ধ করে দিতেন। দাদু এমনিতে চুপচাপ থাকলেও কখনও কখনও প্রতিবাদ করে বসতেন। তখন আবার আর এক নাটক। কান্নাকাটি, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাওয়া। সম্পর্কটা একেবারে শেষের দিকে এমন হয়েছিল যে দাদু-দিদা কথা বললেই ঝগড়া হত। কিন্তু আশ্চর্য, দাদু চলে যাবার আগে অন্তত পাঁচ-সাত দিন ওঁদের কোনও ঝগড়া হয়নি। পুরো শান্তি ছিল। তবুও হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে দাদু বাড়ি ছেড়ে চলে যান। আর ফিরে আসেননি।

—তোমরা ওঁর খোঁজ নাওনি?

—হ্যাঁ, কত খোঁজ করা হয়েছে। পুলিশের কাছে ডায়েরি করা থেকে শুরু করে কাগজে ছবি ছাপানো, টিভিতে ঘোষণা কিছুই বাকি নেই। সম্ভব-অসম্ভব নানা জায়গায় ওঁর সন্ধানও করা হয়েছে। এখনও দাদুকে বা ওঁর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে মোটামুটি মেলে এমন কাউকে কোথাও দেখা গেছে খবর পেলেই, আমার মামাদের

কেউ না কেউ হাজার কাজ ফেলেও সেখানে ছুটে যান।

মৃণালকে বাধা দিই। —তোমার দিদাই কি ওঁদের যেতে বলেন?

—না, মামারা নিজে থেকেই যান। দাদুর চলে যাওয়ায় ওঁরাও তো খুব দুঃখ পেয়েছেন।

—তোমার দিদা আগের মতই কি এখনও আছেন?

সকালের প্রখর আলোতেও মৃণালের চোখে মুখে হঠাৎ সন্ধ্যা নামে। না-না, একেবারেই না। দাদু চলে যাবার পর থেকে দিদা যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। মুখে কথা খুব কম। প্রায় সময় গুম মেরে থাকেন। কী সব যেন ভাবেনও। প্রতিদিন স্নানের পর দাদুর ছবির সামনে চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থাকেন। অন্য সময় চিঠি লেখেন। রোজই এক খানা দু খানা। সবই দাদুর নামে লেখা। ঠিকানা শুধু আলাদা আলাদা। রোজ পোস্টও হয় সে সব চিঠি।

—এ সব চিঠির কী হয়?

—বেশ কিছু চিঠি ফিরে আসে ঠিকানা ভুল বলে। অনেকগুলো আবার ফিরেও আসে না।

—তার মানে তোমার দাদু সে সব চিঠি পান?

—জানি না। অনেক চিঠিই হয়তো হারিয়ে যায়। পোস্টাফিসের লোকেরা কিছু চিঠি ফেলেও দিতে পারে। দাদু এ সব চিঠি সত্যি সত্যি পেলে এতদিনে নিশ্চয় ফিরে আসতেন।

—এ কথা জোর দিয়ে তুমি কী করে বলছ, মৃণাল?

—এটা আমার ধারণা। দিদাকে দেখে আমাদেরই এত খারাপ লাগে।

—কিন্তু মৃণাল, নানা ঠিকানায় তোমার দাদুর নামে চিঠি দেওয়ার কারণটা কী? ওই সব ঠিকানার সঙ্গে কি তাঁর কোনও ভাবে এখনও যোগাযোগ আছে?

—এও আমি ঠিক জানিনা। দিদাকে কয়েক বার জিজ্ঞাসা করেও কোনও উত্তর পাইনি। আমার মার মুখে শুনেছি, যে সব ঠিকানায় দাদু কখনও আসতে পারেন এমন সম্ভাবনা আছে, সেই সব জায়গাতেই দিদা চিঠি দেন। হয়তো আশা করেন, দাদু কোনওদিন কোনও একটা ঠিকানায় পৌঁছে ওঁর চিঠি পাবেন।

সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে ভয় হল। হলুদ হয়ে গেছে। যে কোনও সময় সবুজ সংকেত দিতে পারে। মৃণালের কাছ থেকে চিঠি দুটো নিয়ে ছুটলাম ডাকবাক্সের দিকে। যেতে যেতেই মনে হল অদ্বৈত বসু মল্লিক মশাই বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। তাঁর এক্ষুনি ফিরে আসা উচিত।

ভুখা

কাজ থেকে বাড়ি ফিরতে আজ বেলা গেল। সারাদিনের ধান কাটাকাটির পর বাবুদের বাড়িতে ফের হাজিরা দেওয়া। খোরাকির চালটুকু দিতে মেজবাবুর গরজ নেই মোটে। দু-চারবার বলাবলির শেষে তবে চালটুকু মিলল। এদিকে সূয্যি দেবতার ছুটি নিতে বেশি দেরি নেই আর। ঘরে ফেরার শর্টকাটটা আবার চিলাবেল্লি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গেছে। পদমের ঘরে ফেরার তাড়া আছে। কুঞ্জরানী সেই বিহান বেলায় জানান দিয়েছে, ঘরে চাল নেই একটুও। ফিরবার সময় মনে করে যেন সে চাল আনে, নইলে রাতে হাঁড়ি চড়বে না। হাতে খোরাকির চালটুকু নিয়ে পদম তাই শর্টকাটটাই নিয়ে ছিল। সঙ্গে দিনমনি। তারও তাড়া আছে।

সাঁজের আলো নিভু নিভু হয়ে আসে। সূয্যি ঠাকুরের দিন মজুরির বাঁধা কাজটা শেষ। সেও ঘরের পথে। জঙ্গলের পথে আঁধারটা হঠাৎ বেশি মনে হল পদমদের। আঁধার নয়, শাল-পলাশ জঙ্গলের ছায়া পড়েছে পথে। পদম নিশ্চিত হয়। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে বিকাল থেকে। গাছে গাছে পাখ-পাখালির চেল্লামেল্লি। অঘ্রাণের ঠান্ডা বাতাসে মধুর সুগন্ধ। বনের ভিতর ফুল ফুটেছে কত। শালের মঞ্জরীর বাস। নামো দিক থেকে আসা কদিনের কাটা ধানগুলোর সুবাস। সেগুলো জমিতে শোয়ানো—দু-চার দিন রোদ খাবে। পোয়ালটা শুকবে। ধানের রস মরবে। জঙ্গলের পাশে বাস যাবার রাস্তাটা পার হলে ক্ষেত ভরা ধান যতদূর চোখ যায় ততদূর ছড়ানো। এই সব ক্ষেতে তো তারাই লাঙ্গল দেয়, বীজতলা করে, রোদে জলে ধান রোয়, নিড়ানি দেয়, সার দেয়। তারপর এক সময় ধান ফুল যখন ফল দেয় তখন ধান কাটে, পোয়াল শুকয়, গোলা বাঁধে। সে, নবীন কিস্‌কু, মহেশ হেম্‌ব্রম, গুপী বেস্‌রা, নীরদ মাহাত, শুকদেব মাহাত, দীনমনি দাস এই সব মানুষেরা। এদের কারও জমি নেই, তবু পরের জমিতে সোনা ফলাতে তাদের কসুর নেই।

বনের পথে চলতে চলতে আঁধারটা ভারী হয়ে আসে। 'টুকুন চাঁড়ে চল, দীনু।' পদম তাড়া দেয়। 'চিলাবেল্লি জঙ্গলে বনবরহা আছে, বাঘও কভি আসে রাত বিরেতে।'

'জানি-ত! ওই মেজ বাবুটই তো খামোকা দের করাল্যে।' দীনু হাঁটার গতি বাড়ায়।

খানিক এগোবার পর দীনু হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। 'পদমরে', গলায় ভয়, 'কেমন একটা দুদ্দাড় আবাজ পাছিস না? মনে লয় গাছ ভাঙ্গার শব্দ।'

পদম কান পেতে শোনে। দীনু ঠিকই বলেছে। 'ইটা হাতি বটে! ফি বছরই ই সময়টায় উয়ারা লামে। কিন্তুক আর কথা লয়, দমে (জোরে) ছুট লাগা। মনে হয় হাতিটি ধারে কাছেই আছে।'

পদমরা চলার গতি অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু কিছুটা যেতেই ওদের চোখে পড়ে সামনের রাস্তা বন্ধ। একটা দাঁতাল মনের সুখে ডাল ভেঙ্গে খাচ্ছে। ভাগ্য ভাল, একটাই। নিশ্চয় কোনও দলছুট। হাতির চোখ পড়ে যায় পদমদের দিকে। দুজনের হাতে ধরা থলে। থলেতে চাল। চালের বাস পেল নাকি হাতিটা! সে বিশাল শুঁড় ঊর্ধ্বে তুলে ডাক

ছাড়ে। চোখের পলকে দীনমনি পাশের ঘন ঝোপটার ভেতর সেঁধিয়ে যায়। পদম পড়ে যায় শুঁড়ের নাগালে। কিছু ভাববার আগেই সে দাঁতালটার পেটের নীচে গড়িয়ে আসে। জঙ্গলের দেবীই যেন তার হাত ধরে টেনে আনে। দাঁতালটা তার ছোটছোট চোখ ঘুরিয়ে পদমকে খুঁজতে থাকে। খুঁজছে কিন্তু দুপেয়েটাকে পাচ্ছে না। এমন বিচিত্র পরিস্থিতিতে হাতিটি কখনও পড়েনি। সে হতচকিত ভাবে নিজের শুঁড় নামায়। মুখ নিচু করে মানুষটাকে খোঁজে। কোথা থেকে পদমের বুদ্ধি জোগাল। সে দেরি করে না এক মুহূর্ত। কেঠো কেঠো শক্ত দুটো আঙুল হাতির দু চোখে গুঁজে দেয়। প্রথম বারের খোঁচাটা তেমন জোরালো হয়নি। দাঁতাল হাতিটি হতভম্ব হয়ে যায়। সে আরও মুখ নামিয়ে যন্ত্রণার উৎসটাকে খোঁজে। এতে পদমের আরও সুবিধা হল। সে দ্বিতীয় খোঁচা দেয়। এবার বেশ জোরে। তৃতীয়বার চোখে পদমের আঙুল ঢুকতেই হাতিটি দুদ্দাড় করে উল্টো দিকে পালাতে থাকে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে পদম। চালের থলেটা মাটিতে পড়েছিল। গামছাতে চাল বাঁধা ছিল বলে ক্ষতি হয়নি কিছু। জোর বরাত ওর। ওর আজ নতুন জনম হল বটে।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে দীনমণি। দুরুদুরু বুকে সে এতক্ষণ দাঁতাল হাতির সঙ্গে পদমের লড়াই দেখছিল। পদম বেঁচে ফিরবে সে ভাবেনি। হাতি পালাতেই সে পদমকে জড়িয়ে ধরে। মুখে তার বিস্ময়ের আনন্দ। 'পদম, তুই নিশ্চয় তন্ত্র জানিস! কী করে তুই অমন ক্ষ্যাপা হাতিটার পেটের তলায় রবারের বলের মতো গড়ালি! হাতিটাকে ভাগালি কিসে পদম?'

পদমের ঘোর তখনও আছে। যা ঘটে গেছে তা তার কাছে মস্ত বিস্ময়। 'কী জানিরে দীনু, কুথা দিয়ে কী হলঅ! হামি জীবনের মায়া ছাড়েই দিয়েছিলি! ই সবই মা মনসার দয়া।'

দু হাত জোড় করে পদম বারবার কপালে ঠুকতে থাকে। দেখাদেখি দীনমণিও।

গাঁয়ে ফিরে দীনমণি খবরটা ছড়ায়। 'পদম তন্ত্র জানে, হাতি খেদাবার মন্ত্র জানে উ।' তারপর তার নিজের চোখে দেখা পুরো ঘটনাটা সে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন ভাবে পেশ করে যে গাঁয়ের লোকের বিশ্বাস জন্মায় পদম মাহাত মস্ত সাধক, হাতি গুণ করার ক্ষমতা রাখে সে।

এরপর হাতি নিয়ে আবার একটা ঘটনা ঘটল যাতে পদম মাহাতর নাম তার নিজের গ্রাম বালিতোড়েই আটকে থাকল না, দ্রুত ছড়িয়ে গেল আশপাশের আরও অনেক গাঁ-গঞ্জে।

সেবার তিনটে হাতির একটা ছোট দল বালিতোড়ের দিকে হানা দিল। পাকা এবং আধপাকা ধানের খেত তছনছ করা দিয়ে আরম্ভ। কিন্তু তাতেই ক্ষান্ত না হয়ে হাতিগুলো বালিতোড়ের পাশের গ্রাম ফুলতোড়ার গৃহস্থ বাড়িতেও হামলা শুরু করল। দু গাঁয়ের লোক ছুটে এল পদমের বাড়িতে। 'পদম, তুমি হাতিখেদা এস্‌পার্ট, হাতির হাত থিক্যা গাঁ বাঁচাও।'

পদম নিজের অসহায়তা জানায়। সে বলে, সে হাতি খেদাতে জানে না। কিন্তু কেউ ওর কথা শোনেনা। উভয় সঙ্কটে পড়ে সে। কী করে সে এখন! এক দিকে মনের মধ্যে শতেক ভয়, কঞ্জরানীর মানা, অন্যদিকে গাঁয়ের এত লোকের অনুরোধ,

নামের লালচ্। উভয় সংকটের দোলায় পদম দোলে। এই সময় বালিতোড়ের পঞ্চায়েত প্রধান, সুরেন মাহাত, ওকে ডাকে।

'কাজটা কর, পদম। পঞ্চায়েত থিক্যা তুমাকে নগদ ট্যাকা দিব। ধানও দিব কিছু। তা ছাড়া জেরাইতে (জে. আর. ওয়াই—জহর রোজগার যোজনা) কামও দিব।'

প্রধানবাবু ট্যাকা দিবে, ধান দিবে, কাজও দিবে। এই বতরে (সুযোগে) পদম দু পয়সা করে লিবে। ইদিকে অ্যাত গুলান লোকে নাম লিছে। সে নাকি হাতি খেদা এস্‌পার্ট! হ্যাঁ, ঠিক, ভুখা পদম লড়বে ভুখা হাতি গুলানের সঙ্গে। সে জানে ইবারের হাতিগুলান গুণ্ডা লয়, খট্‌রাগী (বদরাগী) লয়, উয়ারা হেথা সেথা যাচ্ছে পেটের ধান্দায়, ভখের জ্বালায়। পদম রাজি হয়ে যায়। 'পধান বাবু, অ্যাত বলার কিছু নাই। আপনি বলছেন আইজ্ঞা, কামটা হামি করব।'

পরদিন দুপুরে ভরপেট্টা ভাত খাবার পর সবে পদম নাক ডাকাতে শুরু করেছে। এই সময় খবর আসে হাতিগুলো রাজীব কিস্‌কুর বাড়ির নামো দিকে বড় বাঁশ বাগানটায় মনের সুখে বাঁশপাতা খাচ্ছে। খানিক আগেই ওরা বাঁধের পাড়ে নবীন ময়রার কলাচারাগুলো ধ্বংস করেছে। খবর পেয়ে পদম উঠে বসে। ওর উঠোনে টোপাকুল গাছটার পাশ থেকে বাতিল সাইকেল টায়ার একটা তুলে নেয়। কোঁচড়ে বেঁধে নেয়, গোটা কতক জোরালো পটকা বা ফটাকা। এ গুলো কাল সন্ধ্যার আগেই সে জোগাড় করে রেখেছে।

আগড় খুলে পদম ঘর থেকে বার হতে যাবে, কুঞ্জরানী দুহাত বাড়িয়ে ওকে আটকায়। 'না, তুমি যাবেক নাই। হাতি খেদাবার কাজ লয় তুমার।'

পদম দু-চোখ উদাস তুলে ধরে। কুঞ্জর কাঁধে ডান হাতটা রাখে। 'ইটা আর হবার লয়রে, কুঞ্জ। পুরা গাঁটা এখন আমার পানে ভালে আছে (তাকিয়ে আছে)।'

'তুমি উয়াদের বল না কেন ই সব বাজে কথা। সব মিছা। হাতিখেদা মন্ত্র তন্ত্র কিছুই তুমার জানা নাই।' .

'উয়ারা মানবেক নাই, কুঞ্জ। হাতি খেদানর কথাট দীনমণির কাছ থিক্যা এমন চাউর হবার পর লকে (লোকে) হামার কথা আর মানবেক নাই। উয়ারা ধরে লিবে হামি হাতিগুলান খেদাছি না। উয়াদের গোঁসা হবেক। মকে (আমাকে) ভগ্‌লা (মিথ্যাবাদী) মানবে। লকের আক্কোশও (আক্রোশ) হবেক পধান পঞ্চায়েতের কাজ দিবেনা, ট্যাকা দিবেনা, ধানও দিবেনা। গাঁয়ের লোকেও কুনও কাম দিবেনা। পুরা ভখে ছুয়াপুত (ছেলেপিলে) লিয়ে মরা ছাড়া উপায় থাকবেক নাই।

কুঞ্জর দুচোখে জলের ধারা নামে। পদম ঠিকই বলেছে। গাঁয়ের লোক রুষ্ট হলে, দিন আনা দিন খাওয়া লোক তারা খিদেয় মরবে। সে কোনও কথা বলতে পারেনা। পদমের পথ ছেড়ে দেয়।

কুঞ্জর দিকে এক পলক তাকিয়ে পদম নিজেকে কঠিন করে। মনে সাহস আনে। ওর সাঁইত্রিশ বছরের কালো ছিপছিপে শরীরটার কোষে কোষে বীর্য ছলকিয়ে ওঠে। সে পদম মাহাত, জনখাটা মুনিস পদম লয়, হাতি খেদা এস্‌পার্ট পদম মাহাত। সে হারবেক নাই। মা মনসা তার ভরসা।

রাজীব কিস্‌কুর বাড়ির কাছে পদম যখন পৌঁছল, হাতিগুলো ততক্ষণে সেখান

থেকে সরে গেছে উত্তর দিকের ঝোরাটা পার হয়ে। পদম এটাই চাইছিল। আরও উত্তরে পটমদার সীমানা। সেখান থেকে সোজা রাস্তা চলে গেছে দলমার পাশ দিয়ে টাটানগরের দিকে। এই দিকেই হাতিগুলোকে ঠেলে দিতে চায় পদম। চেনা পথ ধরে ওরা ঘরে ফিরে যাক। এদিকে বিকেলের আলো দ্রুত মরে আসছে। যা করবার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। পদম বেশি ভাবেনা। সঙ্গের লোক কটাকে সে একসঙ্গে কেনেস্তারা পিটতে বলে।

টিন পেটার হঠাৎ আওয়াজে শান্ত নির্জন পরিবেশ বিঘ্নিত হয়ে ওঠে। বিরক্ত হয় হাতিরা। নেহাৎ অবজ্ঞার চোখে টিন পেটা লোকগুলোকে দেখে একবার। তারপর হাতিগুলো ডাইনে ঘুরে যায়। সর্বনাশ! ওদিকে যে বালিতোড়ের রাস্তা। তার নিজের গাঁ। একবার বালিতোড়ে পৌঁছলে হাতিগুলোকে ফেরানো মুশকিল হবে। ওদের তাই যেমন করেই হোক পটমদার রাস্তায় ঠেলতেই হবে। পদম পরপর কটা ফটাকা ফাটাল। চকোলেট বোমার তীব্র আওয়াজে হাতিগুলো বেমক্কা চমকে ওঠে। তৃতীয় বোমাটার শব্দে ভয় পেয়ে ওরা বালিতোড়ের পথে আরও এগিয়ে যায়। পদম প্রমাদ গোণে। যে করে হোক হাতিগুলোকে বিহার সীমানা পার করাতেই হবে। না পারলে গ্রাম শুদ্ধ লোক তাকে দুয়ো দেবে।

কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা তার মলিন আঁচল খানা ছড়িয়ে দিয়েছে। আকাশের বুকে একটা দুটো করে তারাদের জ্বলে ওঠা শুরু। রাতঘন হলে পদমের আর কিছু করবার থাকবে না। হাতে আর সময় নেই, পদম তাই বেশি ভাবে না। কেরোসিনে ভেজানো কাপড়ে আগুন ধরায় সে। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে মশাল। সেই আগুনে বাতিল টায়ারটাকে ভাল করে ধরিয়ে নেয় সে। তারপর জ্বলন্ত টায়ারটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে এগুতে থাকে। পদম নিশ্চিত হাতিগুলো ঘুরন্ত আগুন দেখে ভয় পাবে। সত্যি সত্যিই জ্বলন্ত টায়ার ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে যাওয়া পদমকে দেখে হাতির ছোট দলটি হকচকিয়ে যায়। সেই মুহূর্তে মুহুর্মুহু ফটাকা ফাটাতে থাকে পদম। হাতির দল এবার ভয় পায়। ওরা একসঙ্গে ফিরে দাঁড়ায়। তারপরই সামনের দিকে অর্থাৎ বিহার সীমানা লক্ষ্য করে জোর কদমে এগোতে থাকে।

পশুদের পশ্চাৎপদ দেখে পদমের নামে জয়ধ্বনি ওঠে। সে যে হাতিখেদা এস্‌পার্ট তা অনেক লোকের চোখের সামনে প্রমাণ হয়ে গেল। এই পদম নিশ্চয় সাধক। সবাই মেনে নিল হাতির পেটের তলায় রবারের বলের মতো গড়াবার ক্ষমতা পদমের আছে। দীনমণি একটুও মিছে কথা বলেনি।

এরপর পদমের নাম ছড়িয়ে পড়ে আশে পাশের গাঁ-গঞ্জের সীমানা ছাড়িয়ে জেলার সদর পর্যন্ত। ধারে কাছের কোনও গ্রামে, এমনকী জেলার কোথাও হাতি নামলে লোকে পদমকে খবর দেয়। না করবার উপায় থাকে না তার। শতেক মানুষের হাজার অনুরোধ। তাই কুঞ্জরানীর নিষেধ না মেনে পদমকে ছুটে যেতে হয়। তবে আজকাল সে আর একলা যায় না। ইতিমধ্যে বালিতোড় আর ফুলতোড়ার জোয়ান মরদ বেশ কটা সাহসী ছেলে ওর সঙ্গে জুটে গেছে। গ্রামের লোকে ওদের বলে হাতি খেদা পার্টি। পদম ওদের নেতা। এদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী আর ডাকাবুকো নিতাই মুর্মু—বাইশ বছরের তরতাজা ছেলে, শক্ত শরীর, মজবুত গড়ন আর চওড়া

বুকের পাটা। নিতাই হয়ে দাঁড়ায় পদমের ডান হাত। সারা বছর সবাই দিন মজুরি করলেও নভেম্বর থেকে মার্চ অর্থাৎ অঘ্রাণ থেকে চোত এই কটা মাসে ওরা ডাক পেলেই কাজ নেয়, হাতি বিতাড়নের কাজ। মাঠের ধানে হলুদ রং ধরলেই হাতির দল আসতে থাকে দলমা পাহাড় থেকে অথবা ময়ূরভঞ্জের জঙ্গল থেকে। আধ পেটা খাওয়া হাতির দল ঝাঁপিয়ে পড়ে এপারের খেতে-জঙ্গলে।

আগে আগে পদম লোকের কথাতেই কাজ নিত। হাতি খেদালে লাউটা—মুলোটা পাওয়া যেত। তা ছাড়া পঞ্চায়েতের কাজ হলেই ওর কাজ বাঁধা। নাম হয়ে যাবার পর ইদানীং ফরেস্ট ডিপার্টের বড় কর্তারা ওকে ডেকে কাজ দেন। এক এক দফায় কম করে পনের দিনের কাজ। তখন চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী টাকা। হপ্তায় হপ্তায় পেমেন্ট। সে টাকা ভাগ হয় পার্টির ছেলেদের মধ্যে। পদম নিজের জন্য বেশি রাখে না—টাকার বড় অংশটাই সে তুলে দেয় ছেলেদের হাতে। দেবে নাই বা কেন! ওর হাতিখেদা দলের সবাই যে গরিব ঘরের; দিন মজুরি ছাড়া তাদের আর কোনও সংস্থান নেই।

কোথা কোথা থেকে পদমদের খবর পেয়ে এবার খবরের কাগজ থেকে লোক এসেছে। পদম মাহাতর বাড়ি বলতেই লোকে দেখিয়ে দিল।

পদম বাড়িতেই ছিল। কাগজ বাবুকে দেখে সে মহাখুশি। তার কত নাম —ই বার কাগজে তার খবর ছাপা হবে, ছবি ছাপা হবে। কুঞ্জরানীকে ডেকে কাগজ বাবু শুধোয়, 'আপনার ছেলেরা বড় হলে কি বাপের মতই হাতি খেদাবার কাজ করবে?'

ভয়ে শিউরে উঠেছিল কুঞ্জরানী। 'না না, ইটা হামি হতে দিবনাই। ম'র তিন বেটার কেউ ই কাজ করবেক নাই। কাজটায় বড় খতরা।'

'পদম বাবুকে কেন এই বিপদের কাজে যেতে দিচ্ছেন। তবে?'

একটু চুপ করে থাকে কুঞ্জরানী। চোখে ওর বিষাদের ছায়া। 'না দিয়া উপায় কী! উ মানা শুনবেক নাই।'

পদম হাহা করে হাসে। 'উয়ার কথা শুনবেন না, কাগজ বাবু। ছেল্যাদেরও হাতিখেদা এস্‌পার্ট বানাব, দেখে লিবেন। উয়াদেরও বহুৎ নাম হবেক।

কাগজের বাবু জানতে চান, 'এ কাজে পয়সা কেমন, পদম বাবু?'

'পয়সার কথা বইলবেন না আঁইজ্ঞা। হামরা সব খাটিমজুর কিন্তুক বছর ভর খিদাতে মরি। হাতি খেদার কাজ পাল্যে কটা দিন তবু পেটটা ভরে। গেল বার কাজট বেশি ছিল। বছরভরের খোরাকি হল সকলের। ঘরটাতেও নতুন পুয়াল দিলি। তবে ই বছর আমদানি কম।'

কাগজ বাবুর সঙ্গে কথা বলার ফাঁকেই ফরেস্ট গার্ড কার্তিক দলুই হাজির। 'পদম বাবু, রেঞ্জার সাহেব ডেকেছে। কুইলাপালের দিকে হাতি নেমেছে। খেতিবাড়ির ক্ষতি করছে খুব।'

'আপনার কাজ এল, পদম বাবু। চলুন, আপনার সঙ্গেই যাই। বীট অফিসে যাবেন তো?'

পদম উঠে পড়ে। 'কাগজ বাবু, নিজেই শুনলেন তো? ফরেস্টগার্ড বাবু আমাকে তুই তোকারি করে নাই, নাম ধরি বুলে নাই। নামের পর বাবুট যোগ দিছে। পদম বাবু! বুঝলেন? ইটাই বহুৎ মানের ব্যাপার। আমার বউ ইটা সম্‌ঝাতে লারে।'

কাগজ বাবু পদমকে সমর্থন জানিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যান। 'পদম বাবু, হাতি তাড়াবার সময় আপনারা নাকি ইঁট পাথর ছোঁড়েন? বল্লম দিয়ে ওদের খোঁচান? তীর ছোঁড়েন? এ সব করলে হাতি খেপে যায় না?'

পদম প্রতিবাদ করে ওঠে। 'ইটা ঠিক লয়, কাগজ বাবু। কুনও কুনও গাঁয়ের লোক কখুনও কখুনও ই সব করে, তবে হামরা ইসব চাই না। হাতিকে মিছামিছি মারা হামদের না পসন্দ্। ই জন্যইতো হামরা হাতি খেদাতে ফটাকা আর আগুনের খোঁজ লিই। হাতি যে গণেশ দেবতা, হামদের খিদার অন্ন দেয়'।

কথা বলতে বলতে ফরেস্ট বীট অফিস এসে যায়। গার্ড কার্তিক ঠিকই বলেছে। একটা মাঝারি গোছের হাতির দল দলমা থেকে চলে এসেছে। বান্দোয়ান—চিরুডি-কুইলাপাল রাস্তা বরাবর দলটা এখন কুইলাপাল বীটে ঢুকেছে। ওই অঞ্চলের খেতিবাড়ি তছ্নছ্ করে দলটি আরও পূর্বমুখী। এই অবস্থায় হাতির দলকে যে করেই হোক দলমার পথে ফেরাতে হবে। এ কাজ পদম ছাড়া করবার কেউ নেই।

পরের দিন সকালেই পদমের দলবল তৈরি। দুপুরের আগে অভিযান শুরু। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সূত্রে খবর এসেছে হাতির দলটা কুইলাপাল বীটের উত্তর পূর্ব দিকে আগাডি জঙ্গলে আপাতত রয়েছে। কতক্ষণ সেখানে থাকবে বলা কঠিন। বন বিভাগের আরও খবর, দলে তিনটি পুরুষ ছাড়াও সাত-আটটা মাদী হাতি আছে। এ ছাড়াও আছে গোটা দুয়েক বাচ্চা।

আগাডির জঙ্গলে পদমদের দল পৌঁছবার আগেই হাতির দল সেখান থেকে সরে যায়। প্রথমটায় ওদের কোনও সংবাদ না থাকলেও পরে বন বিভাগের মাধ্যমে খবর এল দলটি পাঁচ ছ' মাইল দূরে নূতনডিহার ধানক্ষেত সাফ করার কাজে এখন ব্যস্ত।

পদমরা যখন নূতনডিতে হাতির দলের সাক্ষাৎ পেল তখন মাঝরাত গড়িয়ে গেছে। শেষ রাতের ক্ষয়া ক্ষয়া চাঁদের আলোয় মাঠ জঙ্গল একাকার। বাতাসে রহস্যময় ফিসফিসানি। জঙ্গলের কিনারে একটি বড় জলাশয়। ধানক্ষেত ধ্বংস করা তৃপ্ত হাতির দল জলাশয়ের ধারে আস্তানা গেড়েছিল। কটি হাতি আশেপাশে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে, কটি আবার জলে গা ডুবিয়ে বসে। পদমদের মনে হল একটি বড় 'মাকনা' এই দলের নেতা। শুঁড়ের নীচে মুখের দুপাশে খাঁড়ার মতো তার গজদন্ত না থাকলেও আকারে সে সব চাইতে বড়। ওকে এক নজরে দেখেই বোঝা যায় ওর ঘাড়, মাথা এবং শুঁড় খুব শক্তিশালী। আধো অন্ধকারে কাল্‌চে ধূসর শরীরটাকে স্থির করে সে রেখেছিল।

শান্ত এই দৃশ্যে এবং শিষ্ট এই হস্তীযূথে কোনও আপাত বিপদের সংকেত ছিল না। শেষ রাতের স্নিগ্ধ পরিবেশে হাতির দলের শান্তি বিঘ্নিত করতে চায়নি পদমরা। ওরা সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু রাত শেষের অন্ধকারে কাতারে কাতারে গ্রামের মানুষ হঠাৎ জায়গাটা ঘিরে ফেলল। হাতিরা ওদের ভয়ানক ক্ষতি করেছে। ওদের ধান খেয়েছে, ক্ষেতিবাড়ি তছনছ করেছে, কলা গাছ থেকে বাঁশঝাড় সব ধ্বংস করেছে। মাটির ঘরও ভেঙেছে কটা। হাতির পায়ে দুজন জখমও হয়েছে। ওরা তাই ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত। তীর-ধনুক, বল্লম, টাঙ্গি, লাঠি, পাথর, জ্বলন্ত মশাল এই সব নিয়ে হাতির দলকে ঘিরে ধরেছে ওরা। একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বে।

ক্যানেস্তারা ও ধামসার দমাদ্দম পিটুনির আওয়াজে নিস্তব্ধ শান্ত পরিবেশটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হঠাৎই খান খান হয়ে গেল। ঘিরে ধরা মানুষ জনের সমস্ত রকম অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হতে লাগল হস্তীযূথ লক্ষ্য করে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন এবং পদমদের সনির্বন্ধ অনুরোধে উন্মত্ত জনতা যখন নিরস্ত হল, তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে। বাচ্চা সহ একটি মা-হাতি আহত। জখম হয়েছে আরও দুটি হাতি। ওদের মধ্যে একটি আবার দাঁতাল। আহত হাতি ভয়ঙ্কর, এ কথা জঙ্গলের সকলেই জানে। ক্রুদ্ধ দাঁতাল তেড়ে আসতেই ভিড় দ্রুত পাতলা হয়ে যায়।

এবার পদমদের কাজ। ওরা হাতির দলকে লোকালয়ের সীমানা থেকে সরিয়ে জঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে। কুইলাপাল বীটের নতুন জঙ্গল ওদের আশু লক্ষ্য। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওরা আহত ও ক্ষিপ্ত হাতিদের হঠাৎ ঘাটাতে চাইছিল না। এদিকে বেশি দেরি হলে দাঁতাল ও তার সঙ্গীরা নূতনডি এবং আশেপাশের গ্রাম গুলোতে প্রতিশোধের হামলা চালাতে পারে। সাত পাঁচ ভেবে পদমরা কাজ শুরু করতে এগোল।

গ্রামের মানুষদের ক্যানেস্তারা ও ধামসা পিটুনি থেমে যাওয়ার বেশ খানিকটা পরে পদমরা পরপর কটা পটকা ফাটাল। প্রথমে ছাড়া ছাড়া, তারপর তিন চারটে এক সঙ্গে। কিন্তু পটকার শব্দে বিশেষ কাজ হলনা। দু চারটে হাতি এদিক ওদিক সরে যেতে লাগলেও যূথপতি মাকনা ঘাড় সিধে করে দাঁড়িয়ে থাকল। এদিকে আহত দাঁতাল গর্জন করতে করতে চকিতে এগিয়ে আসে। দাঁতালের বৃংহণ ও পদভারে বনাঞ্চল কাঁপতে থাকে। পদমরা কিছু বুঝবার আগেই নিতাই কী করে যেন আহত দাঁতালের আওতার মধ্যে চলে আসে। ক্রুদ্ধ চিৎকারে ছুটে এসে পলকে সে নিতাইকে শুঁড়ে জড়িয়ে মাথার উপর তুলে নেয়। পদমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। মহেশ মুর্মু-কোঁচড় থেকে পটকা বার করে ছুঁড়তে যাচ্ছিল—পদম ইশারায় ওকে নিষেধ করে। এ সময় পটকা ফাটালে দাঁতাল ভয় পেয়ে অথবা আরও রেগে নিতাইকে সজোরে ছুঁড়ে দিতে পারে। তাতে নিতাই-এর নিশ্চিত মৃত্যু।

ভাবনার এত সময় নেই। পদম দ্রুত এগিয়ে দাঁতালের পেটের তলায় বলের মতো গড়িয়ে যায়। হাতে ধরা ছোট ইস্পাতের কাঁটাওয়ালা দণ্ডটা দিয়ে হাতির গলায় সজোরে আঘাত করে। ব্যাপারটা ঠাহর হতে হাতি শুঁড় নামায়। পদম আবার আঘাত করে—এবার আরও জোরে চোখের পাশে। অকস্মাৎ এমন আঘাতে আহত দাঁতাল এবার ভয় পায়। থমকে দাঁড়ায় সে। মুহূর্তের মধ্যে নিতাইকে ছুঁড়ে দিয়ে গভীর বনের দিকে সে চলতে শুরু করে।

ভয়ঙ্কর ভাবে আহত নিতাইকে তড়িঘড়ি পদমরা হেলথ সেন্টারে নিয়ে এল। কিন্তু সেখানকার ডাক্তার বাবুর কিছু করার ছিল না। দাঁতালের শুঁড়ের প্রচণ্ড চাপে নিতাই-এর পাঁজরার কটা হাড়ই শুধু ভাঙেনি, ওর লাংসটাও মারাত্মক ভাবে জখম হয়ে গেছিল। বাইশ বছরের ছটফটে নিতাই এক সময় তার কালো পাথরের মত শক্ত মজবুত দেহটার মায়া কাটিয়ে চলে যায়। পদমের চোখে জল পড়েনা, সে যেন হঠাৎ বিস্ফোরণে কালো পাথরের ধ্বংস স্তূপ।

এরপর দু দিন পদম চুপচাপ ঘরে বসে থাকে। কেমন উদাস তার দৃষ্টি। মুখে ওর আপসোস খালি, 'ছুয়াটাকে বাঁচাতে পারলি না।' তিনদিনের দিন খানিকটা ধাতস্থ

হতে থাকে সে।

সে রাত্রে কুঞ্জরানী পদমকে গভীর মমতা ও ভালবাসায় বুকে জড়িয়ে ধরে।

'হাঁগঅ, তুমি ইবার ই কামট ছাড়ি দাও।' কুঞ্জর গলায় উদ্বেগ।

'কুন কামট বুলছিস?'

'হাতি খেদাবার কামট। বড় খত্‌রার কাম ইটা। নিতাই-এর কী হল সি তো তুমি নিজেই সাক্ষী।'

পদমের মুখ থমথম করে ওঠে। নিখাদ বিষাদের ছায়া নামে ওর চোখের পাতায়। সে কথা কিছু বলে না।

'কিগঅ! হামার কথাট মানবেক তো?'

নিচু স্বরে কান্না ঝরানো গলায় পদম এবার উত্তর দেয়।

'নারে কুঞ্জ, সিটি হবার লয়।'

'কেনে হবার লয়? মানুষের জানটর কি কুনও দাম নাই?' কুঞ্জ রেগে ওঠে।

'জানটর তরেই তো ই কাম হামি কইরব। ই কামট না কইরলে খাব কি বল? মুনিস খাটায় রোজগার কত, তুই তো জানিস। বছরের সব দিন কামই মিলে না। হাতিকে না খেদালে হামদের ভখে দিন যাবেক। বুঝলি না কুঞ্জ, ইটা দু ভুখার লড়াই। ই লড়ায়ে একজনেরই জিৎ। দুজনের এক সাথে জিৎ হয় না কুনওদিন।'

কুঞ্জ পদমের কাঁধে মাথাটা রাখে। হ্যাঁ পদম ঠিকই বলেছে। হয় হাতি খাবে, নয় মানুষ। নিজের ভূমে শীতে খাবার জোটেনা বলেই হাতি অন্য ভূমে পাড়ি দেয়। খেত লুঠ করে। গোলা শেষ করে। সামনে যা পায় সব দস্যুর মত ধ্বংস করে। তাকে তাই তাড়াতেই হবে। তাড়াবার কাজ পদমদের। পদম, তারপর তারা ছেলেরা, সেই সঙ্গে ভূষণ মাহাত, গণেশ বেস্‌রা, রজনী সর্দার, মহাদেব মুর্মুরা। তারও পরে তাদের বংশধররা। এ ভাবেই চলবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

কুঞ্জর চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। সে পরম ভালবাসার উষ্ণ আলিঙ্গনে পদমের শক্ত শরীরটাকে জোরে চেপে ধরে।

রাজপথ-জনপথ প্রান্তর

পরাগ হাঁটছিল। হাঁটছিল তো হাঁটছিলই। আগে ঠিক করেছিল কখনও বাসে, কখনও ট্যাক্সিতে, কখনও বা অটোতে শহরটা ঘুরে নেবে। তাড়াতাড়ি সব দেখে নেবে কারণ এখানে থাকার মেয়াদ কম। কন্ডাক্টেড ট্যুর একটা নিলে ভাল হত, কিন্তু সে ওটা পছন্দ করে না। ওতে দেখার আনন্দ নেই।

হঠাৎ পরাগের অফিস ওর থাকার মেয়াদ বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিল। তাই হাতে এখন সময় যথেষ্ট। সময় যখন পর্যাপ্ত তখন পায়ে হেঁটে ঘোরাই ঠিক। এতে দেখাটা ভাল হয়। দেখার জায়গা ও বস্তুগুলোও মনে গেঁথে যায়। তাই এখন পরাগের প্ল্যান হল যত পার হাঁটো। হেঁটে হেঁটে শহরটাকে চষে ফেল। নতুন দিল্লি, পুরনো দিল্লি, উঠতি দিল্লি—সব। এখানে পড়তি কিছু নেই। থাকলে হাঁটতে হাঁটতে সেখানেও সে যেত।

পুসা রোড, রাজিন্দর নগর পার হয়ে পরাগ শর্টকাট রাস্তাটা নেয়। গোল মার্কেটের কাছে ওর সম্পর্কীয় দাদার একফালি আস্তানা। এটাই ওর বর্তমান গন্তব্য। খানিক এগোতেই বাঁহাতি একটা ঝাঁ-চকচকে রাস্তা পড়ে। নতুন হয়েছে। নামের ফলক এখনও মনে হয় লাগানো হয়নি। দিল্লিতে এমন নতুন নতুন কত রাস্তা হচ্ছে। তবে এ রাস্তাটা বেশ। বর্ষার পর শরতের নতুন আলোয় দু'ধারে শ্যামলসবুজের ছড়াছড়ি। রাস্তার দু'পাশেই বিস্তর খোলা জায়গা, অনেক ঝোপঝাড়। দু-চারখানা ছাড়া বহুদূর কোনও বাড়িও চোখে পড়ে না। নয়া বসত গড়ে উঠতে দেরি আছে। নির্জন রাস্তা। দু-চারখানা অ্যাম্বাসাডর বা মারুতি কখনও-সখনও হুস করে উড়ে যায়।

নয়া রাস্তাটায় পা দিতেই ঘামে ভেজা পরাগের মনটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে। ঘাম জ্যাবজেবে শরীরে সে বাতাস বড় মোলায়েম লাগে। এই রাস্তাটা দিয়ে খানিকটা গিয়ে আর একটা রাস্তা সম্ভবত নিতে হবে। সেটা হয়তো মন্দির মার্গের দিকে গেছে। না গেলে ঘুরে আসতে হবে এখানে। মন্দির মার্গে কালীবাড়ি। চেনা লোক ক'জন আছে ওখানে। গোল মার্কেটের গোলে ঢুকবার আগে এখানে একটু আড্ডা দেবে সে।

চলতে চলতে হঠাৎ পরাগ দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা কাতরানির আওয়াজ আসছে। হ্যাঁ, কারও যন্ত্রণাক্লিষ্ট আর্তনাদ। কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। আবার সেই যন্ত্রণার শব্দ। এবার আরও স্পষ্ট। চতুর্দিকে নজর ঘুরিয়েও পরাগ কিছু দেখতে পায় না। রাজধানীর জনপথ প্রান্তরে শেষ দুপুরে নিশ্চয় ভুল শুনেছে সে। কিন্তু ভুল কী করে হবে! সে যে স্পষ্ট শুনল চাপা আর্তনাদ। ওর মনে শঙ্কা জাগে। জায়গাটা অসম্ভব নির্জন—এত নির্জন যে এখানে অনায়াসে দিনদুপুরে মানুষ খুন করা যায়। রাজধানীতে অনেক কাল দুর্বৃত্তের দল জাঁকিয়ে বসেছে। এরা নাকি অসম্ভব নিষ্ঠুর। সামান্য দু'চার টাকার জন্যও ছুরি-বন্দুক চালাতে এদের বাধে না। এদের কেউ যদি এখন এমন জায়গায় পরাগকেই বেছে নেয়! ভয় পায় সে। পা চালাতে চায় দ্রুত।

কিন্তু ওর এগনো হয় না। আর্তনাদটা আবার শোনা যায়। এবার আরও স্পষ্ট, মনে হয় আরও কাছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কেউ কষ্ট পাচ্ছে খুব। কোনও মহিলা নয়ত!

পরাগ ডান দিকে ভাল করে দেখে। ওদিক থেকেই কাতরানিটা আসছে। খানিকটা তফাতে কালো পাথরের ছোট টিপি একটা। চারদিকে আগাছার ঘন ঝোপ। শব্দটা কি সেখান থেকেই আসছে? নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেদিকেই এগোতে থাকে পরাগ। কালো পাথরের কোল ঘেঁষে ঝোপের আড়ালে কে যেন শুয়ে আছে। পিঙ্ক রঙের কাপড়ের অংশ দেখা যাচ্ছে ওর। মেয়েছেলে! এমন ভুতুড়ে নি৲ - তায় একটি মেয়ে মাটিতে পড়ে! এখানে ও এল কী করে? তার মানে গণ্ডগোল। এ সবে তার থাকা উচিত নয়। পরাগ দু পা পিছিয়ে আসে।

আবার যন্ত্রণার শব্দ। পরাগের পা দুটো আটকে যায়। বেঁচে আছে। বেঁচে আছে এখনও। এমন একটা মুমূর্ষু প্রাণকে ফেলে চলে যাওয়াটা একান্ত অমানবিক হবে না? কিন্তু সে একা কী করতে পারে? ধারেকাছে জনপ্রাণী নেই। একটা-দুটো গাড়ি কখনও-সখনও যাচ্ছে বটে, কিন্তু হাত দেখালে কেউ দাঁড়াবে কিনা সন্দেহ।

না দাঁড়াক গাড়ি। পরাগও দাঁড়াবে না। যে পড়ে আছে সে পড়ে থাকুক। নির্জন রাজপথের ধারে নারীঘটিত ব্যাপারে না থাকাই ভাল। বিদেশ বিভুঁই-এ কোন ঝামেলায় সে জড়িয়ে যাবে ঠিক নেই। ভীতু বাঙালি, দরকার কী এ সবে! পরাগ ভাবে চলে যাবে। কিন্তু মানুষটা যে এখনও বেঁচে আছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ওকে হয়তো বাঁচানো যায় এখনও।

পরাগের চলে যাওয়া হয় না। যা থাকুক কপালে, একটা মরণোন্মুখ জীবনকে ফেলে সে পালিয়ে যাবে না। ছুটে আসে সে ঝোপের পাশে। সেখানে অচেনা এক অপমানিতা মানবী বিস্রস্ত বসনে অর্ধ চৈতন্যে। কে এ? সুন্দরী তো নিশ্চয়। খুবই সুশ্রী। কিন্তু এ এখানে এমন অবস্থায় পড়ে আছে কেন? পরাগ হাঁটু মুড়ে বসে। ঝুঁকে পড়ে দেখে। না জ্ঞান আছে। আস্তে ওকে নাড়া দেয়। চোখ খোলে মেয়েটি। ভাসা ভাসা ক্লান্ত চোখ। নাকে পাথর বসানো ছোট্ট নাকছাবি।

'কী হয়েছে আপনার? ক্যা হুয়া আপকী? হোয়াটস দা রং?'

মেয়েটি নির্বাক চেয়ে থাকে। কথা বলে না। সারা মুখে আতঙ্কের ছায়া।

'ভয় নেই আপনার। কী হয়েছে বলুন।' হিন্দি বাংলা ইংরেজিতে পরাগ একই কথা বলে যায়। সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

মেয়েটি কিছু উত্তর দেয় না তবু। ইশারায় জল চায়।

'জল! জল কোথায় এখানে?'

সুন্দরী মেয়েটি মাথা দেখায়। হেডেক। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

এক মুহূর্তের দ্বিধা। পরাগ তরুণীর কপালে হাত রাখে। না ঠাণ্ডা। উত্তাপ নেই। মেয়েটি এতক্ষণে অস্ফুট বলতে পারে, 'পানি। ওয়াটার।'

পরাগ চারিদিকে নজর বোলায়। এখানে একফোঁটা জল নেই কোথাও। হতাশায় সে মাথা নাড়ে। 'এখানে জল নেই। উঠুন, একটু এগিয়ে দেখি।'

মেয়েঠি ওঠে না। ওঠার চেষ্টাও করে না। যেমন ছিল তেমনই থাকে।

দ্রুত নিজের কর্তব্য ঠিক করে নেয় পরাগ। এভাবে মেয়েটি পড়ে থাকলে তার রিস্ক আরও বেড়ে যাবে। এমনিতেই কত হাঙ্গামা পোয়াতে হবে কে জানে! মাটিতে আচ্ছন্নভাবে পড়ে থাকা মেয়েটির ঘাড়ের তলায় নিজের একটা হাত ঢুকিয়ে দেয়

সে। অন্য হাতে ওর কাঁধ চেপে ধরে। গোঙানির মত আওয়াজ করে ওঠে মেয়েটি। ওর সারা মুখে একরাশ ভয় ছড়িয়ে পড়ে।

তরুণী মেয়েটিকে তুলে বসায় পরাগ। বসিয়ে ছেড়ে দেয় না। 'আপনি ওঠার চেষ্টা করুন। আপনাকে উঠতেই হবে। এখানে আর বেশি সময় থাকা নিরাপদ নয়।'

'আমি কোথায়?' অতি কষ্টে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে।

'আপনি এখন একটা নতুন রাস্তার ধারে আছেন—ফাঁকা জায়গা। তবে আপনার ভয় নেই। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করুন।'

ইংরেজিতেই কথা হয়। হিন্দি মেয়েটি ঠিক বুঝতে পারছে না। সাজ-পোশাক ও ইংরেজি বলার ধরনে বোঝা যায় সে দক্ষিণ ভারতীয়।

মেয়েটি ওঠার চেষ্টা করেও পারে না। পরাগ বোঝে এমন নির্জন জংলা জায়গায় আর থাকা ঠিক নয়। নিরাপদ কোথাও ওদের এখনই যাওয়া দরকার। সে তাই আর ভাবে না। মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে বুকের কাছে তুলে নেয়।

কয়েকটি অবশ মুহূর্ত। পঁচিশ বসন্ত পার হওয়া পরাগের সারা দেহে শিহরণ। বুকের মধ্যে হঠাৎই ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত। না। পরাগ নিজেকে চোখ রাঙায়। একটা অটো আসছে। খালি মনে হচ্ছে। অসহায় মেয়েটিকে বাঁচাতেই হবে।

ইশারা করতেই অটো থামে। ভাগ্য ভাল। অটো চালক বিনা প্রশ্নে মেয়েটিকে ওর গাড়িতে বসাতে সাহায্য করে।

'কোথায় যাবেন বলুন। কোথায় আপনাকে পৌঁছে দেব?'

এখনও ঘোরের মধ্যে আছে মেয়েটি। ভয় আর অনিশ্চয়তা ওর মুখে ফুটে উঠেছে। পরাগের কথায় ওর সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'জানি না'।

বিরক্ত হয় পরাগ। কোথায় যাবে মেয়েটি জানে না বলছে। চালাকি! নিজের বাড়ির হদিস দিতে চায় না। কিন্তু সে এখন কী করে! কোন নিরাপদ জায়গায় একে নিয়ে যাবে? এ কোন গভীর গাড্ডায় সে পড়ে গেছে রে বাবা।

'কালীবাড়ি।' অটো চালককে গন্তব্য জানায় পরাগ।

অটো রিকশ ছোটে। রাস্তার দিকে চোখ রেখে পরাগ ভাবতে থাকে কে এই হতভাগ্য মেয়েটি। ঝোপের পিছনে বিবস্ত্র প্রায় পড়ে ছিল কেন? ও কি নরখাদক দুর্বৃত্তদের শিকার হয়েছিল? নিশ্চয় তাই। কিন্তু এর মধ্যে ওর নিজের জড়িয়ে পড়াটা ঠিক হল না।

কালীবাড়ির সামনে আটো থামে। ভাড়া মিটিয়ে মেয়েটিকে নামতে সাহায্য করে পরাগ। অতি কষ্টে সে নামে। ওর সারা মুখে যন্ত্রণা আঁকা। পরাগের শরীরে ভর দিয়েও ওর হাঁটতে ভীষণ কষ্ট। কোনও মতে ভেতরে ঢোকে। মন্দিরের সামনে ঘাসের কার্পেট পাতা। সেখানে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে মেয়েটি।

এ কি! নিদারুণ ভয়ে আঁতকে ওঠে পরাগ। মেয়েটির কাপড়ে অনেক রক্ত। শুকিয়ে এলেও বোঝা যাচ্ছে। তা হলে তো তার অনুমানই ঠিক। দিল্লির দুর্বৃত্তদের শিকার হতভাগিনী।

নিজের রুমালটা ভিজিয়ে আনে পরাগ। ভিজে রুমাল দিয়ে মেয়েটি তার ঘাড় গলা মুখ মোছে। জল চায়। তারপর পরাগের হাত ধরে কলের পাশে যায়। আঁজলা

ভরে জল খেতে খেতেই নিজের মাথাটা পেতে দেয় জলধারার নিচে! পরাগ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের কর্তব্য ভাবতে থাকে। কাউকে ডেকে পুরো ব্যাপারটা জানানো উচিত। কিন্তু কাকে জানাবে! এখানকার কর্তৃপক্ষকে? তার চেনা দু-একজন যারা কালীবাড়িতে উঠেছে তাদের কাউকে? কে কীভাবে সমস্ত জিনিসটাকে নেবে জানা নেই। তবে এটাও ঠিক, আর দেরি না করে মেয়েটিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। তারপর থানায়।

ও কি, মেয়েটি যে খোলা কলের নিচে মাথাটা পেতেই আছে! এ পাশে-ও পাশে দু-চারজন কৌতূহলী মানুষ। কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে জল নিয়ে নিজের শরীর ধুয়ে নিতে চাইছে। কাপড়ও! রক্তের দাগ জলে ধুতে চাইছে? লোভের কামাতুর স্পর্শকেও? হাসি পায় পরাগের। জলে কাপড়ের দাগ হয়ত ধোয়া যাবে। কামুক স্পর্শকেও। কিন্তু মনের দাগ! সারা জীবনের হাজার ধারাস্নানেও সে দাগকে মুছে ফেলা যাবে কি!

'উঠুন এবার। অনেকক্ষণ জলে আছেন।'

'আর একটু প্লিজ।'

'না আর নয়। এবার উঠে আসুন। লোকে আপনাকে দেখছে। এদিকে আপনি তো কাপড় ভিজিয়ে ফেললেন—এখন পরবেন কী?'

'ভিজে কাপড়েই থাকব।' শান্ত উত্তর আসে।

'বলেন কী! আপনার অসুখ করে যাবে যে!'

'কিছু হবে না। ভিজে কাপড়ে বেশ ভাল লাগছে। অনেক ফ্রেশ। এতক্ষণ যে গোটা শরীরটা জ্বলে যাচ্ছিল।'

'কিন্তু ম্যাডাম, কাজটা ঠিক হল না।'

'কেন?'

'আপনি ইতিমধ্যেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভিজে কাপড়ে এখন থাকলে তামাশাটা ভালই জমবে। আনফরচুনেটলি আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও কৌতূহলের বিন্দুতে এসে গেছি।'

অন্ধকার নেমে এল মেয়েটির সুন্দর ভেজা মুখে। 'আই অ্যাম সো সরি। ঠিক আছে, আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আমি এখান থেকে বাড়ি ফিরে যাব।'

'খুব ভাল কথা বলেছেন। কিন্তু ম্যাডাম, আপনার কথা আমি মানতে পারছি না। আপনার বর্তমান অবস্থায় কিছুতেই আপনাকে একা ছাড়া যায় না। আপনার পরিচয় পর্যন্ত এখনও জানা হয়নি আমার আচ্ছা, কথা পরে হবে। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?' মেয়েটির সুন্দর মুখে জিজ্ঞাসা নেই। প্রশ্নটা মামুলিভাবে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

'এখানকার গেস্ট হাউসে। দেখি, আপনার জন্য শুকনো শাড়ি-জামা পাওয়া যায় কিনা। আমার পরিচিত এক মহিলা এখানেই এখন উঠেছেন।'

পরাগের কথা শুনে মেয়েটি যেন ভূত দেখে। দু'হাতে সে নিজের মুখ ঢেকে নেয়। 'ও প্লিজ না, কোনও মহিলার কাছে আমাকে নিয়ে যাবেন না। দোহাই আপনার।'

এ কথায় চমকে ওঠে পরাগ। সে কি! একজন মহিলা আর একজন মহিলার

কাছে যেতে চাইছে না, বিশেষ করে এমন অবস্থায়! একটু ভাবতেই অবশ্য ওর কাছে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এখন অন্য কোনও মহিলার কাছে গেলে, এই মহিলাটির কোনও কিছুই আর গোপন থাকবে না। তখন শুকনো শাড়ি-ব্লাউজেও লজ্জা কিছু ঢাকা যাবে না।

কিন্তু আর নয়। অনেক সময় জলে আছে ও। এদিকে উঁকি মারা মানুষজনের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। ফিসফাস শুরু হয়ে গেছে আনাচেকানাচে।

পরাগ এগিয়ে গিতে হাত ধরে মেয়েটিকে টানে। 'আর নয়, ম্যাডাম। এবার আসুন আমার সঙ্গে।'

অত্যন্ত অনিচ্ছা নিয়ে মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। তারও চোখে পড়েছে কিছু মানুষের ঘন ঘন যাওয়া-আসা।

জলের রেখা আঁকতে আঁকতে পরাগের সঙ্গে এগিয়ে চলে মেয়েটি। ভিজে কাপড় ওর দেহে লেপ্টে গিয়ে শরীরের ভাঁজগুলোকে ইঙ্গিতময় করে তোলে। সেদিকে তাকিয়ে পরাগের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। না সত্যিকারের সুন্দরী এই মেয়েটি। দারুণ ফিগার। পুরুষের শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

মহিমদাদের ঘরটা খুলে দেয় পরাগ। ওরা নেই, মুসৌরি বেড়াতে গেছে। যাওয়ার সময় পরাগের কাছে ঘরের চারি রেখে গেছে। ওদের কে একজন আসবে এর মধ্যে। মহিমদা থাকলে ভাল হত। একটু পরামর্শ করা যেত। এই মহিলার ব্যাপারে ওর এখন সৎ পরামর্শ দরকার।

'আপনি এ ঘরে বসুন। আমি দেখি আপনার জন্য শাড়ি-জামা কিছু পাই কিনা।'

শাড়ি-জামা সহজেই পাওয়া গেল। ইন্দিরা বউদি পরাগের কাছে সব কথা শুনে প্রথমে শিউরে উঠলেন। পরে ভয়ে নীল হলেন, আরও পরে নিজের শাড়ি-জামা বার করে পরাগকে বারবার সাবধান করলেন। নিজে এলেন না।

'নিন, এগুলো পরে নিন।' কাপড়-জামা রেখে ঘর ছাড়ে পরাগ।

খানিক পরে সে ফিরে আসে। দু'হাতে খাবার। সঙ্গে চা-এর কেটলি এবং গ্লাস নিয়ে একটি ছেলে।

'খেয়ে নিন এগুলো।'

'আপনি খান। আমি কিছু খাব না।'

মেয়েটির অবস্থা পরাগ বোঝে। পরম সহানুভূতিতে সে বলে, 'সামান্য হলেও কিছু খান। আপনার খাওয়া উচিত। এক গ্লাস গরম চা এখন আপনার পক্ষে ওষুধের কাজ করবে।'

মেয়েটি একটু দ্বিধায় চায়ের গ্লাস তুলে নেয়। চা খাওয়া শেষ হওয়ার আগে কেউ কোনও কথা বলেনি। শেষ হতে ঘরের অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙে পরাগ। 'এবার উঠুন।'

'কোথায়?' মেয়েটির কথায় উদ্বেগ। এতক্ষণ সে যেন বড় নিশ্চিন্ত ছিল।

'থানায়।'

'থানায়? ওখানে কেন?'

'থানায় আগেই যাওয়া উচিত ছিল। অবশ্য এতক্ষণ যাওয়ার মত অবস্থায় আপনি

ছিলেন না। এখন নিশ্চয় অনেক ভাল বোধ করছেন।'

'থানায় আমি যাব না।'

পরাগ আশ্চর্য হয় খুব। থানায় যাবে না কেন বলছে মেয়েটি। মনের ভাব গোপন করে সে বলে, 'মন্দির মার্গ থানা খুব কাছেই। আপনি সেখানে চলুন। যা যা আজ ঘটেছে তার সব কিছুই আনুপূর্বিক ওখানে জানাবেন। আপনার ভয়ের কিছু নেই।'

'পুলিসকে জানাবার মত আমার কিছু নেই।'

'একথা কেন বলছেন? কী ধরনের বিপর্যয় আপনার ঘটেছে আমি তা অনুমান করতে পারি। পুলিসকে সে সমস্ত কথা জানিয়ে আপনার ডায়েরি করা উচিত। ওরা একটু উদ্যোগী হলে শয়তানগুলো ধরা পড়বে।'

'ধরা পড়লে?'

'ধরা পড়লে ওদের বিরুদ্ধে কেস হবে। ওদের শাস্তি হবে। দুর্বৃত্তগুলোর শাস্তি হওয়া খুবই দরকার।'

'শাস্তি! পুলিস শাস্তি দেবে?' সুন্দরী মেয়েটি বিচিত্র মুখভঙ্গি করে। 'যারা অপরাধ করে তাদের পুলিস কখনও শাস্তি দেয়?' মেয়েটির কথায় এবার ঘৃণার ভাব ফুটে ওঠে, 'পুলিস শাস্তি দেয় নিরীহ—নিরাপরাধকে। যে অভিযোগ জানাতে থানায় যায় তাকেই হয়রান করে মারে।'

'ম্যাডাম, পুলিসের ওপর আপনি খুব চটা বুঝতে পারছি। হয়তো আপনার কোনও তিক্ত অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা যাই থাকুক, আপনাকে এখন থানায় যেতে হবে। ডায়েরি করতেই হবে। না করলে আপনি অন্য কোনও বিপদে ভবিষ্যতে পড়ে যেতে পারেন।'

যত জোর এবং যুক্তি দিয়েই থানায় যাওয়ার কথা পরাগ বলুক, মেয়েটি কিন্তু অনড় থাকে। 'আমি কিছুতেই পুলিসের কাছে যাব না, তাতে আমার যা হয় হোক।'

গুম হয়ে যায় পরাগ। কিছুক্ষণ সে কথা বলতে পারে না। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে, 'আপনি আমার ক'টা কথার উত্তর দেবেন?'

'বলুন।'

'আপনার কাছ থেকে সত্যি কথা প্রত্যাশা করছি কিন্তু।'

মুখ তোলে মেয়েটি। ওর মুখে শঙ্কা। সে তার হরিণ কালো চোখ দুটি মেলে তাকায়। একখণ্ড মাঝ-আষাঢ়ের মেঘ সে দুটিতে আটকে আছে। খুব নিচু স্বরে থেমে থেমে মেয়েটি বলতে থাকে, 'পৃথিবীতে সত্যি কথা বলার সুযোগ আমার এখন খুব কমে গেছে। হয়তো আর কোনওদিন কোন মানুষকে সব কিছু সত্যি বলতে পারব না আমি, কিন্তু আপনি আমার জীবনদাতা, কিছুই গোপন নেই আপনার কাছে। তাই আপনাকে, হ্যাঁ আপনাকেই একমাত্র সবটুকু সত্যি বলব। কিন্তু—' হঠাৎ চুপ করে যায় মেয়েটি।

'কিন্তু কী বলুন।'

'আপনাকে একটা কথা দিতে হবে।'

'কী কথা?'

'আপনি কোনওদিন অন্য কাউকে আমার কথা বলতে পারবেন না।'

'এমন কথা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ইচ্ছা না হলে তাই আপনি আমার কথার জবাব দেবেন না।'

মেয়েটি কিছু একটা ভেবে নেয়। 'সব কথা শুনলে হয়তো আপনার মত বদলে যাবে।'

'আগে শুনি। কিন্তু সবার আগে আপনার নামটা বলুন। এত সময় আমরা এক সঙ্গে আছি, অথচ কেউ কারও নামটুকু পর্যন্ত জানি না।'

'তা ঠিক।' এই প্রথম মেয়েটি সামান্য হাসে। 'আমার নাম সরস্বতী। সরস্বতী স্বামীনাথন। সত্যিকারের নাম।'

পরাগ একটু হাসল। 'কোথায় থাকেন?'

'ডব্লু-ই-এতে।'

'কেরল বাগের পাশে?'

'চান্না মার্কেটের কাছে। তবে আমি এ শহরে একেবারে নতুন। চান্না মার্কেটের কাছে আমার দিদির বাড়ি।'

'আপনি মিস না মিসেস?'

'মিসেস। আমার স্বামী বাঙ্গালোরের একটা বড় কনস্ট্রাকশন ফার্মের ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার।'

এরপর সরস্বতী নিজের কথা বলতে থাকে। সে এই শহরে মাত্র দিন দশেক আগে এসেছে। স্বামীর সঙ্গেই এসেছে। মিস্টার স্বামীনাথন রাজস্থানের কোটায় গিয়েছেন—ওঁদের ফার্মের একটা বড় কাজ ওখানে হচ্ছে। ফিরবেন আরও দশ-পনের দিন পরে। উনি ফিরলে ওরা সিমলা পাহাড়ে ছুটি কাটাতে যাবে।

আজ সরস্বতী সকালের দিকেই বেরিয়েছিল। একাই। দিদির বাড়িতে হঠাৎ অনেক গেস্ট এসে গেছে। ওরা সবাই তাই ব্যস্ত। একটা অটো নিয়ে সে যাচ্ছিল দরিয়াগঞ্জের দিকে এক বন্ধুর বাড়ি। গায়ে সামান্য কিছু গয়নাও ছিল। এখানকার পথঘাট চেনা না থাকায় সে জানে না কোন কোন রাস্তা দিয়ে অটো গিয়েছিল। একটা নির্জন রাস্তায় একটা মারুতি গাড়ি পিছন থেকে এগিয়ে এসে হঠাৎ অটোর পথ আটকে দাঁড়ায়। মারুতি থেকে তিনজন লোক নেমে এসে ওকে ধরে টানাটানি করতে থাকে। এক সময় ওকে টেনে নামায় ওরা। ওদের হাতে পিস্তল এবং চপার থাকলেও প্রতিবাদ করেছিল সরস্বতী। চিৎকার করে উঠেছিল সে। কিন্তু কেউ আসেনি। এটুকু মনে আছে একটা দাড়িঅলা লোক ওর নাকে একটা রুমাল চেপে ধরেছিল। তারপরের কথা সরস্বতীর আর কিছু মনে নেই। যখন সে মনে করার অবস্থায় এল তখন সে বুঝেছে তার সব কিছুই লুট হয়ে গিয়েছে।

'এরপর আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না প্লিজ দেখছেন তো আমার গায়ে কোনও গয়না নেই। এমনকি মঙ্গলসূত্রটাও নেই। আমার ব্যাগও নিয়ে গিয়েছে। আমার সব কিছু কেড়ে নিয়ে গেছে শয়তানের দল।' সামনের টেবিলটায় মুখ নামিয়ে সরস্বতী ফুঁপিয়ে ওঠে।

সরস্বতীর সব কথা পরাগ মন দিয়ে শুনছিল। পুরুষ বলে ওর নিজেরই এখন লজ্জা করতে লাগল। ওর মনে হল দেশের রাজধানীতে কি শুধুই হিংস্র জানোয়াররা বাস করে? এখানে কি আইন বা প্রশাসন নেই? এ শহরকে কি সভ্য বলা উচিত? পরাগের

মনে পড়ল কিছুকাল আগে সে কাগজে একটা ছবি দেখেছিল। কোনও এক শহরের মেয়েরা মৌন মিছিলে হেঁটে যাচ্ছে। হাতে তাদের নানা প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন। সে সবে লেখা—মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করো। মা বোনেদের সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে দাও।

সরস্বতী কথা শেষ করতেই পরাগ লাফিয়ে ওঠে। 'চলুন, এখনই থানায় যাই। পুলিসকে সব ঘটনা জানিয়ে ডায়েরি করতে হবে।'

'থানায়? না না, সেখানে আমি যাব না। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি।'

'কিন্তু ম্যাডাম, পুলিসকে সব ঘটনা না জানালে জানোয়ারগুলোর সাহস যে বেড়ে যাবে। আপনি কি চান না ওরা ধরা পড়ুক? ওদের সাজা হোক?'

সিদ্ধান্তে অটল থাকে সবস্বতী। 'আপনি হয়তো ঠিক বলছেন। কিন্তু আমি জানি থানায় গিয়ে আমাদের মত সাধারণ লোকের কোনও সুরাহা হয় না। উল্টে ওখানে গেলে আমাদের নাকালের একশেষ হতে হবে। মিস্টার—'

'আমি গাঙ্গুলি। পরাগ গাঙ্গুলি। কলকাতার ছেলে। আপনার মতই দিল্লিতে একদম নতুন। কিন্তু মিসেস স্বামীনাথন, আপনার কথা মেনে নিয়েও বলছি থানায় আমাদের যাওয়া উচিত। এমন জঘন্য ঘটনার কথা পুলিসকে জানানো প্রয়োজন। আপনি উঠুন।'

'আমি তো আগেই বলেছি থানায় আমি যাব না।' সরস্বতী জমাট শক্ত হয়ে থাকে।

পরাগ দারুণ অবাক হয়। সে ভেবে পায় না সরস্বতী স্বামীনাথন কেন পুলিসের কাছে না যাওয়ার জেদ ধরে আছে। তা হলেও যা বলেছে তা কি সব সত্যি নয়? চোলির আড়ালে অন্য কোনও রহস্য আছে নাকি তবে?

'বেশ, থানায় যেতে না চাইলে আপনি যাবেন না।' পরাগ তার কর্তব্য ঠিক করে নিয়েছে। 'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি একাই পুলিসের কাছে যাচ্ছি। আমি যা দেখেছি এবং যা শুনেছি ওদের জানিয়ে আসি। না জানালে পরে আমি অন্য কোনওভাবে জড়িয়ে যেতে পারি।'

'মিঃ গাঙ্গুলি', সরস্বতী ওর চোখ দুটো একবার তুলেই নামিয়ে নেয়। সেভাবেই ধীর শান্ত গলায় সে বলে, 'আমার ইজ্জত বলতে তো আর কিছুই বাকি নেই, সবই লুট করে নিয়ে গেছে জন্তুগুলো। আমি এখন জীবন্মৃত। এই অবস্থাতেও আপনি কেন এই আধমরা মানুষটাকে ঘা মারতে চাইছেন?'

'এমন কথা আপনি বলতে পারলেন?' আহত পরাগ সরস্বতীকে বুঝে উঠতে পারছে না।

সরস্বতী মুখ না তুলেই জবাব দেয়, 'আপনাকে আঘাত করতে আমি চাইনি। আপনি আমার কথাটা দয়া করে বুঝতে চেষ্টা করুন। থানায় গেলে কার কী উপকার হবে জানি না, তবে আমি জানি এতে আমার লজ্জা বাড়া ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না।'

'বড় গোলমেলে লাগছে। একটু বুঝিয়ে বলুন ম্যাডাম।'

'মিঃ গাঙ্গুলি, আমার বিয়ে হয়েছে তামিলনাড়ুর একটি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে। আধুনিক সভ্যতার অনেকখানি আলো পাওয়া সত্ত্বেও আমার স্বামী এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা এখনও গোঁড়া রক্ষণশীলতা পরিত্যাগ করতে পারেননি। তাই

আজকের ঘটনা ওঁরা যদি জানতে পারেন তবে ওই পরিবারে আমার টেকা কঠিন হবে।

সরস্বতীর মুখে এক দোয়াত কালি কেউ ঢেলে দিয়েছে। সেদিকে না তাকিয়েই পরাগ বলতে থাকে, 'ম্যাডাম, এ আপনার ভুল ভাবনা। আজ আপনার স্বামীকে পুরো ঘটনা না জানালে পরে কোনওদিন আপনাকে হয়তো এ জন্য পস্তাতে হবে যা ঘটে গেছে তা যে প্রতিনিবৃত্ত করার ক্ষমতা আপনার ছিল না, এ কথা আপনার স্বামী নিশ্চয় বুঝবেন। হয়তো পরিস্থিতি বুঝে তিনি আপনার প্রতি আরও সহানুভূতিশীল, আরও প্রেমময় হয়ে উঠবেন।'

'মিঃ গাঙ্গুলি, আপনি সম্ভবত এখনও ব্যাচিলর। আপনি তাই স্বপ্নলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনি জানেন না, আমরা যতটা প্রগতিশীল বলে নিজদের জাহির করি ভিতরে ভিতরে আমরা তার অনেকগুণ বেশি রক্ষণশীল। তাছাড়া আমাদের সমাজে আজও একুশ শতকের দরজায় দাঁড়িয়েও, মেয়েদের ক্ষমা করা হয় না। সামান্য অপরাধে যেখানে তাদের বর্জন করা হয়, সেখানে আমি কী করে আশা করব রেপড হওয়া সত্ত্বেও আমায় অপরাধী ভাবা হবে না। শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত বলে মিঃ স্বামীনাথন হয়তো এখনই আমাকে ত্যাগ করবেন না, কিন্তু দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই সন্দেহ ও অবিশ্বাস ওঁর মনে শিকড় গেড়ে থাকবে। তাছাড়া তিনি না চাইলেও ওঁর পরিবারের লোক ছাড়বে কেন? একটা ধর্ষিতা মেয়েকে নিয়ে সংসারটা অশান্তিতে ভরে যাবে। তাই পরে কী হতে পারে না ভেবে আমি এখন শান্তি চাই, নিরাপদ আশ্রয় চাই, স্বামীর ভালবাসা চাই। পুলিসের কাছে গেলে এ সব কিছুই আমার হাতের বাইরে চলে যাবে। কোনও কিছুই আমার আর গোপন থাকবে না। হয়তো কালকে দিল্লির কাগজে কাগজে সত্যমিথ্যার মিশেলে নানা মুখরোচক খবর ছাপা হবে। পুলিসের কাছে গেলে ক্রিমিনালগুলো শেষ পর্যন্ত কী শাস্তি পাবে জানি না, কিন্তু আমার হেনস্তা সবদিক দিয়েই বাড়বে। থানা আর কোর্টের টানাপোড়েনে স্বামী, সংসার, সমাজ—আমার সব কিছুই হারিয়ে যাবে।'

সরস্বতীর কথায় গোটা ব্যাপারটার অন্য এক চেহারা পরাগের কাছে ধরা পড়ে হ্যাঁ, ওর বক্তব্যে যুক্তি আছে। সে যুক্তিকে এক কথায় ফেলে দেওয়া যায় না 'বেশ থানায় যাওয়ার জন্য আপনাকে আমি আর বলব না। আপনার যা ভাল মনে হয় তাই করুন।'

'অনেক ধন্যবাদ, মিঃ গাঙ্গুলি। আপনি আমাকে আরও একবার আজ বাঁচালেন।' সরস্বতীর উজ্জ্বল মুখে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়তে থাকে।

'কিন্তু ম্যাডাম, পুলিসের কাছে না গেলেও ডাক্তারের কাছে আপনাকে যেতে হবে। য়ু নিড ইমিডিয়েট মেডিকাল কেয়ার। তবে এখানেও মুশকিল আছে। পুলিসের মাধ্যমে না গেলে কোনও ডাক্তার হয় আপনাকে দেখবেন না, না হয় তিনি পুলিসকে রেফার করে দেবেন।'

কথাটা ঠিক। সরস্বতী মাথা ঝাঁকাল। এখন একটা উপায় চাই। পুলিসকে এড়িয়ে ডাক্তার দেখাবার একটা উপায় বার করতে হবে। কিন্তু কেমন করে! হঠাৎ সরস্বতীর চোখে আলোর ঝিলিক পড়ে। ডক্টর মিসেস কাপুর আছেন পঞ্চশীল মার্গে। ওঁর সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছিল হুমায়ূন টুম্বে। ওঁর গাড়িতে তখন কী যেন গণ্ডগোল

হয়েছিল, সরস্বতীর ভগ্নীপতি সেটার সামাল দেয়। পরেও ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে পঞ্চশীল মার্গেই জামাইবাবুর এক বন্ধুর বাড়িতে। সব কথা বুঝিয়ে বললে তিনি কি আর ওকে ফিরিয়ে দেবেন? বোধহয় না। আর সিক্রেসি—যেটা সরস্বতীর প্রথম বিবেচনা! সিক্রেসিও নিশ্চয় থাকবে।

সরস্বতীর কথা শুনে পরাগ লাফিয়ে ওঠে। 'চলুন তাড়াতাড়ি। সেখানেই যাই। সমস্যাটা মিটে যেতেও পারে।'

ওরা বেরিয়ে আসে মন্দির মার্গে। সরস্বতী নিজের শরীরের ভার অনেকটাই পরাগের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। অস্বস্তি হচ্ছিল পরাগের। সেই সঙ্গে ভালও লাগছিল বেশ। একটা নতুন অনুভূতি। রাজধানীর লোকেরা প্রায় সব কিছুতেই উদাসীন। তাই একটি সুন্দরী তরুণী একটি নওজোয়ানের কাঁধে এলিয়ে পড়ে পথ চললেও কারও তেমন নজর পড়ে না। কেউ বড়জোর ভাবে এ কোনও নয়া ফিল্মি কায়দা।

পঞ্চশীল মার্গের চেম্বারে ডাক্তার মিসেস কাপুরকে পাওয়া গেল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সরস্বতী ডাক পায়। পরাগ ভেতরে যায়নি। সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে।

বেশ অনেকক্ষণ পর সরস্বতী বেরিয়ে আসে। হাঁটবার ভঙ্গি অনেক সহজ। পরাগ বুঝল ডক্টর কাপুরের কাছে কাজ হয়েছে। তবু জিজ্ঞাসা করে, 'কাজ হল?'

'হ্যাঁ, হল।' সরস্বতীকে অনেকটা ভারহীন লাগে।

'সিক্রেসি? সেটা থাকবে তো?'

'তাও থাকবে। অবশ্য এ জন্য দামটা একটু বেশি লাগছে।'

'এত পরিচিত লোক—তবু দাম লাগছে?'

'দাম না দিয়ে কোথাও কোনও কাজ হয় নাকি, মিঃ গাঙ্গুলি? আপনি সৃষ্টিছাড়া, তাই উল্টে গ্যাঁটের কড়ি গচ্চা দিয়ে পরের ঝক্কি সামলাচ্ছেন।' সরস্বতীর কথা বলার ধরনটা অনেক হালকা হয়ে গেছে।

ওরা একটা অটো নেয়। পাশাপাশি বসে। কাছাকাছিও। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের তাপ দুজনকেই নির্বাক করে রাখে।

এক সময় কালীবাড়ি আসে। গেস্ট হাউসেও পৌঁছে যায় ওরা।

'এবার?' পরাগ সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

'এবার বিদায়ের পালা। আপনি একটু এখানে দাঁড়ান। আমি শাড়ি-জামা বদলে আসি। এতক্ষণে আমার গুলো নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে।'

বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পরাগ। কেমন অবলীলায় সরস্বতী কথাগুলো বলে গেল! বিদায়ের কথা বলতে ওর কি একটুও আটকাল না!

ঘরের দরজা খোলে। পিঙ্ক রঙা নিজের শাড়ি-জামা পরে নিয়েছে সরস্বতী। ওর মুখে-চোখে ঘরে ফেরার তাড়া। 'চলুন।'

'কোথায়? থানায় তো যাবেন না। তবে?'

'বা রে বাড়ি যাব না? এখানে থাকলেই চলবে? ওদিকে কত না জানি ভাবছে আমার দিদি-জামাইবাবু। আরও দেরি হলে থানা—পুলিস করবে।' সরস্বতীর গলা কেমন আদুরে আদুরে, বাড়ির পোষা বিড়ালটির মত।

'হ্যাঁ, বাড়িতেই তো যাবেন এখন। সব কাজ শেষ, না?' হঠাৎ পরাগ সব জোর

হারিয়ে ফেলে।

সরস্বতীর চমক লাগে। ওর মুখেও দ্রুত ছায়া নেমে আসে। সে সামান্য হাসে। 'হ্যাঁ, সব কাজই শেষ।'

আবার রাস্তা। এবার একটা ট্যাক্সি নিয়েছে পরাগ। রাত্রিবেলা অটো নিতে ভরসা পায়নি ঠিক।

পেশওয়া রোড ছেড়ে লিঙ্ক রোডে পড়ে ট্যাক্সি। এবার সরস্বতী এতক্ষণের অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙে। 'জানেন মিসেস কাপুর কত নেবেন?'

'কত?'

'মাত্র কুড়ি হাজার টাকা।'

'কুড়ি হাজার!' চমকে ওঠে পরাগ।

'হ্যাঁ, দশ হাজার সার্ভিস চার্জ। ওষুধ দিয়েছেন। ইঞ্জেকশনও দিয়েছেন দুটো। আরও কী কী সব করেছেন। তিনদিন পরে যেতে বলেছেন। তখন আবার দেখবেন। তখনও দরকার মত ওষুধ-ইঞ্জেকশন দেবেন। এখন শুধু রেস্টে থাকা।'

'হুঁ। বাকি দশ হাজার কিসের জন্যে?'

'ওটা সিক্রেসি রাখার জন্য। পুলিসকে বা অন্য কাউকে না জানাবার মাসুল। বললেন, কমই নাকি নিয়েছেন। এমন কেসে সাধারণত অনেক বেশি লাগে।'

'আশ্চর্য! এরা সব রক্তচোষার দল।' পরাগের মুখ রাগে থমথম করে।

'আপনি যাই বলুন, ডাক্তার কাপুর কিন্তু যথেষ্ট ভাল। আমায় একটা মস্তবড় ফেবার উনি করেছেন। টাকাটা এক্ষুনি চাননি। উনি তো জানেনই আমার কাছে এখন একটি পয়সাও নেই। তাই তিনদিন পরে যখন আসব তখন অন্তত অর্ধেক টাকা, অর্থাৎ দশ হাজার পুরোই দিতে বলেছেন। বাকি দশের জন্য আরও দিন সাতেক সময় পাওয়া যাবে।'

পরাগ সরস্বতীর কথায় উদ্বেগ বোধ করে। 'এত টাকা আপনি পাবেন কোথায়? কাউকে তো আবার জানাতেও পারবেন না। আপনার কাছে আছে?'

সরস্বতী হাসে। 'দেখি। কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'মিসেস কাপুরকে যদি টাকা না দেন?'

'উরি বাবা!' আঁতকে ওঠে সরস্বতী। 'টাকা দিতেই হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই দিতে হবে। না দিলে মিডিয়ার কাছে খবরটা চলে যাবে। আর তা যাবে একটু অন্যভাবে। ডক্টর কাপুর আমায় ওয়ার্নিং দিয়ে রেখেছেন।'

'ব্যবস্থা তাহলে সম্পূর্ণ পাকা। ডাক্তার মহিলার সত্যিই কোনও জবাব নেই।'

'আপনি কত নেবেন?'

'মানে?' সরস্বতী কী বলছে পরাগ ঠিক বুঝতে পারে না।

'এই আপনার সার্ভিসের দাম ও সিক্রেসি রক্ষার মূল্য।'

কেউ যেন ঠাস করে পরাগের গালে একটা চড় মারে। ওর কালো মুখটা রাগে আরও কালো হয়ে যায়। ফুঁসে ওঠে সে, 'হোয়াট ডু য়্যু মিন?'

সরস্বতী এটাই যেন আশা করেছিল। অদ্ভুত ভাবে সে পরাগের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখে ওর মধুর কারুণ্যের আলো পড়ে। সে তদগত ভাবে বলে, 'দেখুন

মিঃ গাঙ্গুলি, মানুষ কত রকমের হয়। আজ প্রথমে একদল নরপশু বেআব্রু করে আমার সব কিছু কেড়ে নিল। এরপর এমন একজন এল যে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আমায় লাঞ্ছনা আর যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করল। সে মানুষ না দেবতা আমি জানি না, তবে সে না এলে এতক্ষণে আমি ঘাস-পাথরের রাজ্যে মরে পড়ে থাকতাম। সবার শেষে যে এল তার বৃত্তি মানুষের সেবা। তবে সে ব্যবসা বড্ড ভাল বোঝে। জলঘোলা হলে তার আরও পোয়াবারো।'

দুটো হাত পরাগের কোলের ওপর এসে পড়ে। মুখ না ফিরিয়েও ও বুঝতে পারে সরস্বতীর লম্বা লম্বা আঙুলগুলো ওর হাত দুটোকে জড়িয়ে ধরেছে।

গাড়ি পুসা রোড ছেড়ে চান্না মার্কেটের পথ নেয়। সরস্বতী পরাগের হাতে হাত রেখে বসে থাকে। কেউ হাত সরিয়ে নেয় না। পরাগের বেশ ভাল লাগে। ওর মনে হয় পথটা যেন কোনওদিনও শেষ না হয়।

'বাড়ি এসে যাচ্ছে।' সরস্বতী পরাগের হাতে চাপ দেয়।

পরাগ সম্মোহিতের মত তবু বসে থাকে।

'এখানেই গাড়ি ছেড়ে দিন। খানিকটা রাস্তা আমি হেঁটে যেতে চাই।'

এতক্ষণে পরাগের সম্বিৎ ফিরে আসে। বাস্তব বড় কঠিন। তাকে অস্বীকার করা যায় না।

ওরা ট্যাক্সি থেকে নামে। 'চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাই।'

সাপ দেখার মত আঁতকে ওঠে সরস্বতী। 'এক্সকিউজ মি। আপনি আর এগোবেন না আমার সঙ্গে।'

ভীষণ অবাক হয় পরাগ। কেন, সে সঙ্গে গেলে কী হবে? সরস্বতীরই তো উচিত তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাওয়া। এক পেয়ালা চা বা কফি খাওয়াব আমন্ত্রণ জানানো তো সাধারণ ভদ্রতা।

সরস্বতী বোঝে পরাগের মনের ভাব। 'জানেন আমি এখন নানা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলব দিদির বাড়িতে। গয়না ছিনতাই থেকে আরও অনেক কিছুর আষাঢ়ে গল্প বলব। কিন্তু আপনি থাকলে আমার মুখ দিয়ে কিছুতেই বানানো কথাগুলো বের হতে চাইবে না। হয়তো সত্যি কথা বলে ফেলব। তখন কী হবে বুঝতে পারছেন?'

'দিদির কাছেও সত্যি কথাটা বলবেন না?'

'না। কথা কোথা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে বলা যায় না।'

'তা বটে।'

ওরা অত্যন্ত শ্লথ পায়ে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। গোল চক্করের পাশে এসে সরস্বতী দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর চোখে শ্রাবণের ভরা সন্ধ্যা। 'এবার যাই।'

'যাই নয়, আসি বলতে হয়।'

সরস্বতী ম্লান হাসে। 'একটা কথা মিঃ গাঙ্গুলি।'

'বলুন।'

'আমাদের কিন্তু আর কখনও দেখা হবে না।'

নির্বাক হয়ে যায় পরাগ। ওর বুকের মধ্যে ভীষণ কষ্ট হতে থাকে। কষ্টটাকে

ব করে চাপতে চাপতে সে শুধু বলতে পারে, 'কেন?'

রণ আপনি জানেন। বন্ধুকে, সাথীকে, জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষকে সারাজীবন আমি মনে ধরে রাখতে চাই।'

'দেখা হলে বন্ধুত্ব থাকবে না?' শুকনো মুখে পরাগ শুধু বলতে পারে।

'আপনি একেবারে ছেলেমানুষ, কিছু বোঝেন না মিঃ গাঙ্গুলি। আপনার সঙ্গে বেশি দেখা হলে বাঙ্গালোরের ইঞ্জিনিয়ার স্বামীনাথন সাহেব জনারণ্যে হরিয়ে যেতে পারেন। আচ্ছা চলি। গুড বাই অ্যান্ড গুড নাইট।'

সরস্বতী সামনের দিকে পা বাড়ায়।

আ মরি বাংলা

ড্যাডি— মাম্মি, জানো কাল টোয়েন্টিফার্স্ট ফেব্রুয়ারি।

ডাবলুর ড্যাডি ও মাম্মি চা খেতে খেতে টি ভি দেখছিল। ছেলের কথায় ওরা কৌতুক বোধ করে। মণিকা, ডাবলুর মা, বলে, সো হোয়াট ডাবলু? আজ টোয়েন্টিয়েথ হলে কাল তো টোয়েন্টিফার্স্ট হবেই। কাউন্টিং-এর নিয়মানুযায়ী তাই হয়।

—নো মাম্মি, টোয়েন্টিফার্স্ট ফেব্রুয়ারির একটা অন্য সিগনিফিক্যান্স আছে। এই দিনটা হল ইন্টারন্যাশানাল ডে অফ মাদার ল্যাংগুয়েজ। মাতৃভাষা দিবস না কী যেন বলে। ক্যালকাটায় অনেক জায়গায় সেলিব্রেশন হবে। বড় বড় লোকেরা স্পিচ দেবে। তা ছাড়া মিউজিক হবে, ডান্স হবে, ড্রামাও হবে কোথাও কোথাও।

—কী বললি ডাবলু? কাল ইন্টারন্যাশানাল ডে অফ মাদার লাংগুয়েজ! সে আবার কী? কে বলেছে এ কথা?

—আমি স্কুলে শুনেছি, মাম্মি। জয়তী আন্টি নিজের মুখে বলেছে। ইউ এন ও না কোন একটা ওয়ার্ল্ড বডি নাকি এই ডিক্লারেশন করেছে। পার্টিকুলারলি টোয়েন্টিফার্স্ট ফেব্রুয়ারিকে ইন্টারন্যাশানাল ডে অফ মাদার লাংগুয়েজ বলে ইউ এন রেকগনাইজ কেন করল, মাম্মি? জয়তী আন্টি বলছিল এতে আমাদের, আই মিন বেঙ্গলিদের, দারুণ অনার দেওয়া হয়েছে। কী অনার, মাম্মি?

মণিকা কাঁধ ঝাঁকাল। কাঁধ ঝাঁকিয়েই সে ডাবলুর ড্যাডি ফটিকের দিকে তাকিয়ে ভ্রূজোড়া নাচাল। —তুমি কিছু জানো, ফটিক?

টিভির অ্যাকশন চ্যানেলের একটা উত্তেজক দৃশ্যে ইতিমধ্যেই ডুবে গিয়ে ফটিক কী উত্তর দিল, বোঝা গেল না। মণিকা অগত্যা ছেলেকে বোঝায়, বেঙ্গলিদের আবার আলাদা করে কী অনার দেবে ইউনাইটেড নেশনস? আমার মনে হয় টোয়েন্টিফার্স্ট ফেব্রুয়ারির আলাদা কোনও সিগনিফিক্যান্স নেই। ইট মাস্ট বি জাস্ট লাইক এনি আদার ডে অফ দি মানথ। ইউ এন ও অন্য কোনও দিনকেও ইন্টারন্যাশানাল ডে অফ মাদার ল্যাংগুয়েজ করতে পারত। ইটস সিম্পলি আ কয়েনসিডেন্স। নিজের কথা শেষ করে মণিকা ফটিকের দিকে সমর্থনের আশায় চাইল।

টিভির পর্দা থেকে ফটিক চোখ সরাতে চাইছিল না। বোকাবাক্সের ছবিটা দারুণ একটা নাটকীয় মোড় নিয়েছে। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় স্নায়ুগুলো টানটান। এ সময়ে স্ত্রী-পুত্রের বাক্যালাপে কান দিল না ফটিক।

—ফটিক, ইউ নটি বয়! মণিকার গলায় বিরক্তি। শুনতে পাচ্ছ না? আমি টোয়েন্টিফার্স্ট ফেব্রুয়ারির কথা জিজ্ঞাসা করছি। এ দিনকে নাকি ইউ এন থেকে ইন্টারন্যাশানাল ডে অফ মাদার ল্যাংগুয়েজ বলে ডিক্লেয়ার করেছে?

এবার মণিকার কথা ফটিকের কানে যায়। ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ছোট পর্দায় আর মন থাকে না। মনের গভীরে ও অকস্মাৎ একটা পরম গর্ব ও ভালবাসার বস্তুর সন্ধান পায়। —তাই নাকি? এ তো বিরাট খবর। শুনেছিলাম বটে ইউনেস্কো·বিষয়টি বিবেচনা করছে। তা ওরা যে শেষ পর্যন্ত দিনটিকে মেনে

নিয়েছে, তা জেনে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে, মণিকা। এমন একটা ভাল সংবাদের পর, চলো আজ বাইরে যাই। পছন্দমাফিক যা খেতে চাইবে, তাই খাওয়াব তোমাদের।

—হেল উইথ ইয়োর খাওয়া। ব্যাপারটাতে তোমার এত আনন্দ হচ্ছে কেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—মণিকা, বুঝলে তোমারও আনন্দ হবে। তুমি তো জানো, ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল এক ঝাঁক বাঙালি তরুণ। তাদের সে আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। স্বাধীন বাংলা দেশের জন্ম হয়েছে। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে এই সব শহিদদের স্মরণে বাংলা দেশ জুড়ে শহিদ দিবস পালন করা হয়। সেই গানটা জানো নিশ্চয়—'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি!' তাই বিশেষ করে এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দিয়ে ইউনাইটেড নেশনস বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে মস্তবড় সম্মান দিল। মণিকা, লেট আস সেলিব্রেট। এখন থেকে কাল রাত পর্যন্ত আমরা বাংলায় ছাড়া কথা বলব না, বাংলা গান শুনব, বাংলা কবিতা পড়ব, টিভি দেখব কেবল বাংলা চ্যানেলে এবং বাইরে গিয়ে বাঙালি খানা খাব।

—ড্যাডি, ডাবলু সোৎসাহে বলে, চ্যানেল ওয়ার্ডটা কি বাংলা?

ফটিক হেসে ফেলে। —ঠিক ধরেছিস, বেটা। চ্যানেল ইংরাজি শব্দ। বিদেশি। তবে কথাটা এখন বাংলা-ই হয়ে গেছে। এখন বহু বিদেশি শব্দ আমাদের ভাষাতে এসেছে। এই সব শব্দ বাংলাকে আরও সমৃদ্ধ, আই মিন এনরিচ করছে।

—ব্যাস। ব্যাস। মণিকা বিচিত্র মুখভঙ্গি করে। ডাবলুকে অনেক জ্ঞান দিয়েছ, এবার থামো। আটটায় জি-টিভিতে শাহরুখ খান এবং জুহি চাওলার ডুয়াল পারফরমান্স আছে। ওটা আমি দেখব। কুন্তীরা বলছিল এতে নাকি শাহরুখ ইজ অ্যাট হিজ বেস্ট।

—মণিকা, আজ ওসব প্রোগ্রাম বাদ দাও। কাল একুশে ফেব্রুয়ারি। এই দিনটির সম্মানে আজ সন্ধ্যায় চলো একটা বাংলা থিয়েটার দেখে আসি। অ্যাকাডেমিতে ভাল নাটক আছে। ফেরার পথে বাঙালি খানা।

—হ্যাং ইয়োর বাঙালি খানা। মণিকা ঠোঁট ওল্টায়। মোচার ঘন্ট খেতে আর ডাঁটা চচ্চড়ি চিবুতে কেউ বাইরে যায় না। তবে যদি পার্ক স্ট্রিটের কোনও ভাল রেস্তোরাঁতে চাইনিজ কিংবা তন্দুরি-চিকেন খাওয়াও, তবে না হয় যেতে পারি। শাহরুখের প্রোগ্রাম না দেখার জন্য অ্যাটলিস্ট তখন কুন্তীদের জাঁক করে বলার মতো একটা এক্সকিউজ পাব।

ফটিকের মুখের আলো এক মুহূর্তে নিভে যায়।—থাক মণিকা, আজ বাঙালি খানা বাদ। বাদ বাংলা নাটকও। তুমি বলিউড স্টারদের নিয়েই থাকো। কিন্তু আটটা বাজার এখনও ঢের দেরি আছে, এই সময়টায় অন্তত একটু গান হোক, কবিতা পাঠ হোক, সব বাংলায়।

—ড্যাডি, আমি তো একটাও বাংলা সং অর পোয়েম জানি না। ডাবলু মুখ করুণ করে।

—জানো ডাবলু, জানো। তুমি শিখেছিলে। ভেবে দেখ ভাল করে।

ডাবলুর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। —ইয়েস ড্যাড, আই রিমেমবার, ঠাম্মা আমাকে একটা বেঙ্গলি পোয়েম, আই মিন পদ্য, শিখিয়েছিল—ভোর হল দোর খোল, খুকুমণি ওঠোরে/ঐ ডাকে ফুলশাখে ফুলখুকী ওঠোরে। তারপর কী, ড্যাডি? ও, মেমারিতে এসে গেছে। —রবি মামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ঐ,/ দারোয়ান গায় গান, শোনো ঐ রামা হৈ।। ড্যাডি, হোয়াট ইজ হামা?

—ডাবলু, তুমি আবার ঠাম্মার শেখানো ওই ট্র্যাস ছড়াটা বলছ? মণিকা ধমক দিয়ে ওঠে। —তোমার ড্যাডির ইচ্ছামতো বেঙ্গলি পোয়েম যদি বলতেই হয় তো তুমি টেগোরের সেই পোয়েমটা রিসাইট করো—হয়্যার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার অ্যান্ড দ্য হেড ইজ হেল্ড হাই—

বাধা দেয় ফটিক। না, মণিকা, না। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটা মূল ভাষায় অর্থাৎ বাংলায় বলো—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর,
আপন প্রাঙ্গন তলে, দিবস শর্বরী.....

—স্টপ, প্লিজ স্টপ। মণিকা চিৎকার করে ওঠে। —তোমার ওই বেঙ্গলি পোয়েম আজকাল কেউ পড়ে না, কেউ বলে না, কেউ শোনে না। হঠাৎ অত বেঙ্গলি-বেঙ্গলি করছ কেন? টোয়েন্টিফার্স্ট ফেব্রুয়ারি ইন্টারন্যাশানাল ডে অফ মাদার ল্যাংগুয়েজ বলে? সো হোয়াট? তোমরা এত বোকা যে একটা শস্তা সুড়সুড়িতেই গলে যাচ্ছ। কিন্তু ভেবে বলো, আমাদের মাদার ল্যাংগুয়েজ কি বেঙ্গলি? আদৌ নয়। একদা বাংলা আমাদের মাতৃভাষা হলেও আজকের দুনিয়ায় এই ভাষা অচল। এখন বেঙ্গলি মাধ্যমে পড়ে, বেঙ্গলি শিখে, বেঙ্গলি বলে কিচ্ছুটি হবে না। নাথিং। এমনকী ক্যালকাটা প্রপারেও একটা ভাল চাকরি জুটবে না, নট ইভন আন্ডার দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট।

—কী পাগলের মতো কথা বলছ, মণিকা? বিস্মিত ফটিক। —তুমি বাংলার মাস্টারমশাই-এর মেয়ে হয়ে এবং নিজে বাংলায় অনার্স গ্রাজুয়েট হয়ে বাংলাকে এমন ভাবে হেয় করতে চাইবে, তা ভাবাই যায় না।

—আমি হেয় করছি না, ফটিক। কিন্তু একজন বেঙ্গলি টিচারের দুর্দশা নিজের চোখে দেখেছি বলেই এমন ভাবে আমার ভাবনার কথা জোর দিয়ে বলতে পারছি। তুমি তো জানো, আমার ড্যাডের অন্য সব কলিগের কাছে গাদাগাদা ছেলেমেয়ে প্রাইভেট পড়তে আসত। এমনকী ইতিহাস-ভূগোলের টিচাররাও দু বেলা পড়াতেন। পড়াতেন না শুধু আমার ড্যাডি। এর পেছনে কোনও আদর্শ-টাদর্শ খুঁজতে যেও না আবার। আসলে কোনও ছাত্র-ছাত্রীই ভাল করে বাংলা পড়তে চায় না, কোনওমতে পাশ নম্বর পেলেই ওরা খুশি। বাংলা ইজ নট অ্যাট অল ইম্পরট্যান্ট। অ্যাজ আ রেজাল্ট, মাই ড্যাড ইজ দ্য পুয়োরেস্ট অ্যামং দ্য টিচার্স। নিজের একটা বাড়ি পর্যন্ত করতে পারেন নি। ভাড়া বাড়িতেই সারা জীবন কাটাতে হচ্ছে।

ফটিক সহানুভূতি দেখায়।—হ্যাঁ, এটা নিয়ে ভাবার আছে। তবে আমার আপত্তি তোমার অন্য কথায়। তুমি বললে বাংলায় পড়লে ভাল চাকরি হয় না। এই কলকাতাতেও হয় না। কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। আমি জানি আজকাল পশ্চিম

বাংলার পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে বাংলা মাধ্যমে ডাবলু বি সি এস এবং অন্যান
পরীক্ষা দেওয়া যায়।

মাল্টিন্যাশনালের একজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হবার পর থেকে তুমি কূয়ো
ব্যাঙের মতো নিজের অফিসের গন্ডিটিকে শুধু চিনেছ। বাইরের খবর কিছু রাখো না

ফটিক প্রতিবাদ করে ওঠে।—মণিকা, তোমার অভিযোগ ঠিক নয়। তাই তু
অন্য কথা বলছ। আমি ভাল করেই জানি পশ্চিম বাংলার পাব্লিক সার্ভিস কমিশ
বাংলা মিডিয়ামে সব পরীক্ষা দেওয়া যায়।

—হ্যাঁ যায়। বাট উইথ হোয়াট রেজাল্ট? তুমি অতীশকে চেন, আমার কাজি
ব্রাদার। এত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, বারডোয়ান য়ুনিভার্সিটি থেকে মডার্ন হিস্ট্রিত
ফার্স্টক্লাশ। কিন্তু ওর কোনও চাকরি এতদিনেও হল না। দু-দুবার নেট এবং স্লে
পরীক্ষায় বসল। প্রতিবারই বিলো ফিফটিন পারসেন্ট। দু বার ডাবলু বি সি এসে
বসেছিল। কোনও গ্রুপেই ও চান্স পায়নি।

ফটিকের মুখে তির্যক হাসি ফুটে ওঠে। —নাইনথ পেপারের জো
য়ুনিভার্সিটিতে ভাল রেজাল্ট করা যায় মণিকা, কিন্তু তাতে চাকরি জোটে না
আজকাল কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য একটু অন্য পড়াশোনা করতে হয়, দুনিয়া
খবর রাখতে হয়। তোমাদের অতীশ ইতিহাসও ঠিক ঠিক জানে কি না আমা
সন্দেহ। দোষটা অবশ্য ওর সব নয়। আজকাল এডুকেশন মানে শিক্ষা নয়, পরীক্ষ
পাশ করা। কিন্তু চাকরির বেলায় শুধু ওতে হয় না। পুঁথি পড়া জ্ঞান এবং পুঁথি
বাইরের জ্ঞান দুটোই দরকার। এই আমাকে দেখো, এম. এসসিতে জাস্ট একট
সেকেন্ড ক্লাশ। কিন্তু চাকরি পেতে তো আমার অসুবিধা হয়নি।

মণিকা লাফিয়ে ওঠে। হিয়ার য়্যু আর, ফটিক। নাউ কাম টু দ্য পয়েন্ট। আমি
ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছি। শোনো. চাকরির বাজারে তোমার মতো ছেলেদে
ডিম্যান্ড বেশি থাকবেই, অতীশদের নয়। কারণ একটাই। তুমি ক্যালকাট
বয়েজ—সেন্ট জেভিয়ার্স প্রোডাক্ট। পড়েছ ইংলিশ মিডিয়ামে। তোমরা তৈরিই হয়ে
অন্য স্টাইলে। অতীশদের পড়াশোনা বাংলা মিডিয়ামে। বাংলায় পড়াশোনা করে
বলে ফার্স্ট ক্লাশ পেলেও ওর চাকরি হয় না। আসলে চাকরির বাজারে অতীশদে
দাম কানাকড়ি। এমন কী স্টেট সার্ভিসের পরীক্ষাতেও ওরা আনফিট। এ জন্য
বলছি, ফরগেট বেঙ্গলি। আজকের দুনিয়ায় টিকতে গেলে ইংলিশ মাস্ট বি ইয়ো
মিডিয়াম অফ এডুকেশন। এই সঙ্গে অন্য কোনও ভাষা যদি পড়তেই হয়, ইট শু
বি হিন্দি। দ্যাট উইল আলটিমেটলি হেল্প। বাট বেঙ্গলি? বেকার সময় নষ্ট।

ভিতরে ভিতরে ফটিক হারতে থাকে। মণিকা ঠিকই বলেছে। বাংলায় ঘরে
ভেতর কাব্য করা যায়, প্রেমিক অথবা প্রেমিকার সঙ্গে গুঞ্জন করা যায়, টিভি চ্যানে
গানও শোনা যায়, এমনকী আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড পাওয়া বাংলা ফিল্মও দেখ
যায়, কিন্তু বাংলায় পড়াশোনা করলে কাজ পাওয়া যায় না। বাংলা এ দেশে কেজে
লোকের ভাষা কোনওদিন ছিল না, আজও নেই। ভুবনীকরণের যুগে বাংলার চর্চ
তো স্রেফ বিলাসিতা। এই কারণেই হয়তো অলিতে গলিতে ব্যাঙের ছাতার মতে
এত ইংরাজি মাধ্যম স্কুল গজিয়ে উঠেছে। শুধু কলকাতায় নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রা

প্রতিটি ছোট-বড় শহরে একই চিত্র। তবু খটকা থাকে। বাংলা স্কুলগুলোতেও তো পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ছে। প্রতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থিদের সংখ্যাই তার প্রমাণ। হিন্দু-হেয়ারের মতো স্কুলে ভর্তির জন্যও হুড়োহুড়ি। তাই মনে হয় মণিকার কথা আংশিক সত্য। আরও বিবেচনার দিকও আছে নিশ্চয়ই।

—মণিকা, জানো, জাপান, রাশিয়া, ফ্রান্স বা জার্মানি-এই সব অতি উন্নত দেশে ইংরাজির কোন ঠাঁই নেই। এ সব দেশে মাতৃভাষারই জয়জয়কার। এদের শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্য সবই দুনিয়ার সেরা পর্যায়ের। জাপানি, রুশ, ফরাসি বা জর্মনরা তাদের ভাষায় যদি পারে, আমরা বাঙালিরাই বা পারব না কেন? সারা পৃথিবীতে তেইশ কোটির বেশি বাঙালি আছে, একটা স্বাধীন দেশের একমাত্র ভাষা হল বাংলা। এত কিছুর পরও আমরা ইংরাজির লেজুড় হয়ে থাকব?

—ও: ফটিক, তোমার কথাগুলো কত সিলি, তুমি বুঝতে পারছ না। তোমার মধ্যে এখন ইমোশন কাজ করছে, রিজন নয়। ফ্রেঞ্চ বা জার্মান ল্যাংগুয়েজে যা হয়েছে তার জন্য বহু সময় লেগেছে। তা ছাড়া ইংরাজির মতো এই সব ভাষাও হল রুলারদের ভাষা। ইন্ডিয়াতে বেঙ্গলি শাসকদের ভাষা নয়। তাই বাংলাদেশে যদি বা কোনওদিন বেঙ্গলি কাজের ভাষা হয়, ইন্ডিয়াতে তা কখনও হবে না।

—কেন হবে না, মণিকা? বাংলা ভাষা যদি বাংলা দেশের বাঙালিদের হাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে পৌঁছে দিয়ে কাজের ভাষা হতে পারে, তবে এপার বাংলার বাঙালিদের বেলায় পৃথক কিছু হবে কেন? ভাষাকে কি সীমান্তের কাঁটাতার দিয়ে আটকে রাখা যায়?

—ফটিক, তুমি আজ র‍্যাশানাল কথা বলছ না। তুমি আসলে পরিস্থিতিটাই বুঝতে পারছ না। ফ্যাক্ট হল, ইন্ডিয়ার বাঙালি আর বাংলা দেশের বাঙালি এক নয়।

—এক নয়! ফটিকের চোখে বিস্ময়। কী উল্টোপাল্টা কথা বলছ মণিকা? দু পারের বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি অভিন্ন এবং আমাদের উত্তরাধিকার এক। ভবিষ্যৎ হঠাৎ আলাদা হতে যাবে কেন?

—ফটিক, বলতে বাধ্য হচ্ছি, আজ তোমার মধ্যে মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানির সিনিয়র একজিকিউটিভ মিস্টার মিটার কথা বলছে না। এখন তুমি নস্ট্যালজিয়াতে ভোগা এক ইমোশনাল বাঙালি। শোনো ফটিক বাবু, ইন্ডিয়ার বাঙালি আর বাংলাদেশের বাঙালি এক নয় কেন। ফার্স্টলি, ওপারের ওরা মাতৃভাষার জন্য অনেক লড়াই করেছে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, লাইফ পর্যন্ত স্যাক্রিফাইস করেছে। এ পারে আমরা এ সব কিছুই করিনি। হয়তো কিছু করতেও চাইনি কখনও। তা ছাড়া, ইন্ডিয়াতে বাংলা ওনলি ওয়ান অফ দা মেনি রিজিয়নাল ল্যাংগুয়েজেস, বাংলা দেশের মতো এদেশের রাষ্ট্রভাষা নয়। এতেই আমরা স্যাটিসফায়েড। এই পরিস্থিতিতে ইন্ডিয়াতে সারভাইভ করতে হলে আজ ইংলিশ এবং হিন্দি জানা একান্ত দরকার। অল ইন্ডিয়া চাকরি থেকে আরম্ভ করে ইন্ডাস্ট্রি এবং বিজনেসের ভাষা হল ইংলিশ। হিন্দি ইজ নেকস্ট। বাংলার কোনও জায়গা নেই। এমনকী রাজ্য সরকারের কাজেও নেই। ছবিটা হয়তো অন্যরকম হতে পারত, যদি শিল্পে-বাণিজ্যে বেঙ্গলিরা লিডিং রোল নিতে পারত। সেক্ষেত্রে হয়তো বেঙ্গলি মিডিয়ামের ছেলেমেয়েদের কিছু হিল্লে হত। কিন্তু সে গুড়েও বালি। এ সব

কারণে ফোরসাইট আছে এমন সব ফ্যামিলিতে ছেলেমেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে বেঙ্গলিদের বেস্ট ট্যালেন্টস যদি এভাবে মাদার টাংগকে এড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়, তবে তোমার মাতৃভাষার গৌরব আর কত বাড়বে? তাই বলছি লিভ বেঙ্গলি টু বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার বাঙালিরা যত তাড়াতাড়ি বেঙ্গলি ভুলে ইংলিশকে মাদার টাং করে নিতে পারবে, ততই তাদের মঙ্গল।

ফটিক বিপন্ন বোধ করতে থাকে। মণিকার কথায় যুক্তি আছে ঠিকই, কিন্তু এ যুক্তি মানলে স্বকীয়তা বলে যে আর কিছুই থাকবে না। ফটিকের বুকের দক্ষিণ নিলয়ে একটা অসম্ভব কষ্ট লতিয়ে উঠতে থাকে। মাতৃভাষার জটিল গ্রন্থিতে টান পড়লে এমন কষ্ট হয় বোধহয়। স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া মানুষের মতো সে খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চায়। মরিয়া হয়ে তাই সে বলে, রাজ্যে শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, মণিকা। নতুন নতুন স্কুল-কলেজ হচ্ছে এবং সেগুলোর অধিকাংশই বাংলা মাধ্যমে। সেই সব স্কুল-কলেজে অনেক ছাত্র-ছাত্রী পড়ছে। এদের মধ্যে থেকেই বাংলা ভাষার নব রূপকাররা উঠে আসবে। কাজেই এ পারের বাঙালিদেরও হাল ছেড়ে দেবার মতো কিছু হয়নি।

ফটিকের কথায় মণিকা হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারে না। ডাবলু এতক্ষণ ড্যাডি ও মাম্মির কথা শুনছিল। ও যেন ওর ড্যাডির কষ্টটা কিছুকিছু বুঝতে পারে ফটিকের কোল ঘেঁষে আসে সে। —ড্যাডি, আমি আমার মাদার ল্যাংগুয়েজ বেঙ্গলি ভাল করে শিখব। তুমি আমাকে টিচ করবে?

—ডাবলু, স্টপ অল ননসেন্স। তোমার এখনও হোম টাস্ক হয়নি। ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম। সেগুলো চটপট করে নাও।

—আহা, ওকে ওভাবে তাড়াচ্ছ কেন? ওতো কোনও অন্যায় আব্দার করেনি

—করেছে কি না তা বোঝার মতো মেন্টাল সেটিং তোমার নেই। তাই দয়া করে বাংলা-বাংলা করে ছেলেটার মাথা খেয়োনা।

মণিকার বাংলা বিরূপতা ফটিকের কাছে কেমন অস্বাভাবিক লাগে। সে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে তীব্রস্বরে বলে ওঠে, মণিকা, তুমি একজন বাংলা শিক্ষকের মেয়ে, পড়েছ বাংলা মাধ্যমে, অনার্সেও তোমার সাবজেকট ছিল বাংলা। সেই তুমি মাত্র কটা মাস স্পোকেন ইংলিশের স্পেশ্যাল ক্লাশ করে হঠাৎ বাংলার ওপর এত খাপ্পা হয়ে উঠেছ কেন, বুঝতে পারছি না। সত্যি কথা বলতে কী, তোমার ব্যাপারটা আমার কাছে হেঁয়ালি মনে হচ্ছে।

ফটিকের কথায় মণিকার মুখে বেদনা স্পষ্ট হয়। সে কিছু না বলে হঠাৎ উঠে যায়। পরক্ষণেই শোবার ঘর থেকে কিছু একটা নিয়ে আসে।

—এই নাও, পড়ে দেখো। পড়লেই বুঝবে আমি আমার ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন এড়িয়ে যেতে চাইছি।

হাতের কাগজটার ভাঁজ খোলে ফটিক। কিছুদিন আগে লেখা মণিকার বাবার একটা চিঠি। নানা কথার পর তিনি লিখেছেন, মারে, আমাদের মাতৃভাষার ভবিষ্যৎ ভেবে বড় আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি। আমাদের এদিকে পড়ুয়ার সংখ্যা অনেক বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী স্কুল বাড়েনি। গত পাঁচ বছরে এলাকাতে মাত্র একটি

প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে, তাও অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। একটি জুনিয়র হাইকে ইতিমধ্যে অবশ্য হাইস্কুলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তুই ভাবছিস স্কুলে স্কুলে তবে নিশ্চয় খুব ভিড়। নারে মা, ছবিটা ঠিক উল্টো। দুটি-একটি স্কুল ছাড়া প্রায় সব স্কুলেই আরও ভর্তির সুযোগ আছে। অবশ্য আরও কিছু শিক্ষক দরকার এই সব স্কুলে। আসলে কিন্তু অতিরিক্ত স্কুলের চাহিদা মেটাতে প্রায় সর্বত্র নিত্য নতুন ইংরাজি মাধ্যম স্কুল তৈরি হচ্ছে। এসব স্কুলে পড়ার খরচ অনেক। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিজ্ঞতাও কম। তবে এই সব স্কুলের ঠাটঠমক খুব। মজা কি জানিস মা, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের বড় অংশ তো বটেই, নিম্নবিত্তরাও অনেকে বহু কষ্ট করেও তাদের ছেলেমেয়েদের ওই সব স্কুলে পড়াচ্ছে। এদের মধ্যে পঞ্চায়েতের লোকজন থেকে শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী, ছোট-বড় ব্যবসায়ী সবাই আছে। আসলে ওই সব স্কুলে ছেলে মেয়েদের পড়ানোর সঙ্গে একটা স্ট্যাটাসেরও ব্যাপার জড়িয়ে গেছে। তাই বাংলা স্কুলে যারা আসছে তাদের অনেকের অভিভাবকদের মধ্যে একটা হীনমন্যতার ভাব তৈরি হচ্ছে। এর ফলে গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষার মাধ্যমকে কেন্দ্র করে দুটি সুস্পষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব হতে চলেছে। এ বড় বিপজ্জনক বিভাজন হবে মা।

মারে, এখানেই কিন্তু শেষ নয়। এদিকে এদিককার ভিডিও হল ও সিনেমা হল গুলোতে রমরম করে চলে হিন্দি ছবি। কখনও কখনও দু-একটা হিন্দি মার্কা বাংলা ছবি দেখালেও, সে সব ছবি তেমন চলে না। তার মানে শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন ইংরাজির দখলদারি বাড়ছে, সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে হিন্দির আগ্রাসনও তেমন পাকাপোক্ত হচ্ছে। পরিবর্তনের এই ধারা যুগের দাবি কিনা জানিনা, তবে একে রোধ করার ক্ষমতা বা মানসিকতা কারও নেই। তাহলেই বুঝে দেখ মা, বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে। আমার বিবেচনায় দাদুভাইকে নামী একটি ইংরাজি স্কুলে পড়িয়ে তুই অত্যন্ত উচিত কাজ করেছিস। ইংরাজির স্পেশ্যাল কোর্স করেও তুই যুগোপযোগী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিস।

চিঠিটা শেষ হলে ফটিক কথা খুঁজে পায় না। ওর ঘোলাটে দৃষ্টির সামনে দিয়ে ঝকঝকে ইউনিফর্ম পরা ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল মুখগুলো তালে তালে এগিয়ে যায়। তাদের হাতে বিশাল বিশাল ব্যানার আর ফেস্টুন। গাঢ় রঙে ব্যানার আর ফেস্টুনে বড়বড় করে লেখা —লং লিভ টোয়েন্টিফার্স্ট ফেব্রুয়ারি—ইন্টারন্যাশানাল ডে অফ মাদার ল্যাংগুয়েজ।

ফটিক চায় মণিকার দিকে। শূন্য দৃষ্টি মেলে সে বাইরে চেয়ে আছে। দু চোখে মুক্তোর বিন্দু টলমল।

কাঁটাতারের বেড়া

ঘুমটা ভেঙ্গে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসে ত্রিপর্ণা। উ:, কী বিশ্রী একটা স্বপ্ন এতক্ষণ সে দেখছিল। স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন। আরও বলা যায় বিভীষিকার চলচ্চিত্র। সারা শরীর ওর ঘামে জ্যাবজেবে। অথচ আজকের রাতটা বেশ ঠাণ্ডা। সমানে বৃষ্টি হচ্ছে সন্ধ্যা থেকে। ফ্যানের স্পিডটা বাড়াতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু উঠতে ইচ্ছা করছে না। একটা দারুণ ভয় যেন ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। ঘরের আবছা আঁধারে কিছু একটা খুঁজতে থাকে সে। ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাওয়া দুঃস্বপ্নের কোনও টুকরো, অথবা অধরা অতীতের সামান্য স্পর্শ —ত্রিপর্ণা বুঝে উঠতে পারে না।

পাশেই অক্ষয় শুয়ে আছে। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। এত নিশ্চিন্তির ঘুম ওর কোথা থেকে আসে, ত্রিপর্ণা বুঝতে পারে না। অথচ ওর নিজের চোখে ঘুম নেই বলতে গেলে আজ কতদিন। এই যে দেখতে দেখতে সাত-সাতটা দিন কেটে গেল ওরা এখানে আছে, এর মধ্যে একটা দিনও কি ত্রিপর্ণা গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে পেরেছে, যেমন যেত আগে? না, এমনকী ঘুমের বড়ি খেয়েও না। চোখের পাতা বন্ধ করলেই অজানা কোনও আতঙ্ক ওকে তাড়া করে। তখন মনে হয় একটা আর শূন্য, অনুভূতিহীন অবয়ব দুর্গন্ধ ভরা গলিত শরীর নিয়ে ওর কাছে এগিয়ে আসতে চাইছে। নাহ্, ত্রিপর্ণা এসব নিয়ে আর ভাববে না। ভেবে কিছু হয়নি। ও বুঝতে পারছে ভবিষ্যৎ ওর নেই। বর্তমান আত্মগ্লানির তিক্ত স্বাদে নিরন্তর দগ্ধাচ্ছে। ওর একমাত্র সম্বল এখন একটা কীটদষ্ট অতীত।

সুজয়ের কথা এখন খুব মনে পড়ছে। আজই বাংলা কাগজে ওর মৃত্যুর খবরটা বেরিয়েছে। কাগজটা পেয়েই খবরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ত্রিপর্ণা। ভেতরের পাতায় এক কলমের খবর।

সম্ভবত একাধিক ব্যক্তি ঘটনায় জড়িত। আটত্রিশ বছরের সুজয় নাগকে কে বা কারা গলায় ফাঁস জড়িয়ে হত্যা করেছে। ফাঁস দেবার আগে আততায়ীরা তার মাথায় ভারী এবং ভোঁতা কোনও অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিল। মৃতদেহের কাছেই রক্তমাখা একটি মোটা কাঠের দণ্ড পাওয়া গেছে। পুলিশের ধারণা এটি দিয়েই আততায়ীদের একজন মৃত যুবককে আঘাত করেছিল। রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল বলে অনুমান। এই সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। ঘটনার পর খুনীরা ফ্ল্যাটের বাইরের দরজায় তালা দিয়ে যায়। তালাবন্ধ দেখে সবাই ভেবেছিল সুজয়বাবু সস্ত্রীক কোথাও গেছেন। কিন্তু তিন-চার দিন পরে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেয়—বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ বার হচ্ছে। তালা ভাঙ্গার পর সুজয় নাগকে যে অবস্থায় পাওয়া যায়, তাতে পুলিশ মনে করছে মৃত্যুর আগে সে খুনীদের বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। ঘটনার পর থেকে নিহতের স্ত্রীর কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশের সন্দেহ এই হত্যা ত্রিকোণ প্রেমের পরিণতি। তারা সুজয়ের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে এ ব্যাপারে খোঁজ করছে। বন্ধুটিরও কোনও পাত্তা নেই।

খবরটা বার দুই পড়ার পর ত্রিপর্ণা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। সুজয় যে

খুন হয়েছে এই খবরটার জন্য ওর আসলে কোনও কাগজ দেখার প্রয়োজন ছিল না। ও তো জানতই খবরটা। কাগছে ছাপা সুজয় নাগের হত্যার খবর তাই তাদের কাছে নতুন কোনও সংবাদ নয়। তবু সংবাদ এ জন্যই যে সুজয়ের দেহটার শেষ গতি কী হল তা জানা গেল। পুলিশ কী করবে এবং সুজয়ের মৃত্যু নিয়ে তারা কী ভাবছে, তারও একটা হদিশ পাওয়া গেল।

এই রাত গভীরে ত্রিপর্ণার হঠাৎ কেন যেন মনে হচ্ছে সুজয় তার কাছে মৃত হয়ে যায়নি। মনের গহনে ওর প্রতি ভালবাসার গভীর টানে অনুশোচনার একটা চোরা কুঠুরির দরজা হঠাৎ কখন খুলে গেছে। এ জন্যই হয়তো সব কিছুতে ওর এত বিতৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। নিজের প্রতি বিতৃষ্ণা, অক্ষয়ের প্রতিও তাই, হয়তো অনেকটাই বেশি। এতটাই বেশি যে খুনের খবরটা পড়ার পর থেকে সে আর অক্ষয়ের দিকে চাইতে পারছে না। ওর সঙ্গে এক ছাদের তলায় দিন কাটাবার চিন্তাতেও মনে আর একটুও সায় পাচ্ছে না। বরং এমন একটা চিন্তায় আতঙ্ক বোধ করছে। তাই বোধহয় আজ যখন অক্ষয় ওকে বুকে জড়িয়ে জোর করে আদর করেছে, ওর মন তখন ভয়ঙ্কর ভাবে বিদ্রোহ করতে চাইছিল। ওর দারুণ রাগ হচ্ছিল, সেই সঙ্গে অপরিসীম লজ্জা। ওর তখন বারবার মনে হচ্ছিল এই লোভী জন্তুটা তার শরীরটা পাবার জন্যই ভালবাসার ভাণ করে তাকে তার স্বামীর সোহাগ-ভালবাসা থেকে ছিনিয়ে এনেছে। আসলে অক্ষয় নামের এই নরপশুটার মনে তার জন্য ভালবাসা-টাসা কিছু নেই। কোনও দিনও ছিল না। যা ছিল তা শুধু রিপুর তাড়না।

অক্ষয় না হয় লোভী, কামুক এক পুরুষ। কিন্তু ত্রিপর্ণা নিজে কী! অক্ষয়ের প্রতি তার মনে কি সত্যিই প্রেম-ভালবাসা বলে কিছু ছিল না? তবে কি অক্ষয় ছিল শুধু তার খেলার পুতুল, যাকে ইচ্ছা করলেই টান মেরে ফেলে দেওয়া যেত? ত্রিপর্ণা ভাবতে বসে।

ভাবতে গিয়েই লজ্জা। আসলে সত্যিহল, মাত্র কটা দিন আগেও ত্রিপর্ণা বিশ্বাস করত সে হল অক্ষয়ের প্রাণ-ভোমরা। ওর জন্য করতে পারে না অক্ষয়ের কাছে এমন কিছু ছিল না। এখন ত্রিপর্ণার মনে যতই ঘৃণা বা লজ্জা আসুক, এ কথা নিদারুণ সত্যি সে সময় ওরও ছিল অক্ষয়-অন্ত প্রাণ। অক্ষয় ছাড়া ওর কাছে জীবন ছিল অর্থহীন, আলুনী। সুজয়ের মিথ্যাচার ও ছলনার তিলমাত্রও সে অক্ষয়ের মধ্যে দেখেনি। অক্ষয় ওর কাছে ছিল স্বচ্ছ ও উদার। ওর মধ্যে কোনওদিন সে সুজয়ের বর্বরতা, এমনকী রূঢ়তার আভাসটুকুও পায়নি।

ত্রিপর্ণার মনে পড়ে, বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই তার স্বামী দ্রুত নিজের চেহারা পাল্টাতে শুরু করেছিল। রাতের সুজয় ক্রমশ হয়ে উঠতে লাগল ভয়ঙ্কর অত্যাচারী এক ধর্ষকামী পুরুষ। এই পুরুষের মধ্যে কণাটুকুও ভালবাসা খুঁজে পাচ্ছিল না ত্রিপর্ণা। সে ছিল তার কাছে লুব্ধ রিরংসার নির্লজ্জ প্রতীক। স্বভাবতই তার নিজের অন্তরের গোপন কন্দরে এই মানুষটির জঘন্য পীড়নের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার বাসনা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল।

অব্যাহতির পথটাও সুগম হয়ে এল। অক্ষয়, সুজয়ের জিগ্‌রি দোস্ত, জীবনে

এল। সুজয়ই যেন কীসের জন্য ওকে একদিন ডেকে এনেছিল। অক্ষয় এল, ত্রিপর্ণাকে দেখল এবং অতি ধীরে কিন্তু নিশ্চিন্ত ভাবে তাকে জয় করে নিল। জয় তো করবেই। অক্ষয়ের দু চোখে শুরুতে ছিল স্তুতি, তারপর আশ্বাস, আরও পরে প্রেমের আহ্বান। ত্রিপর্ণার মনও উন্মুখ হয়ে উঠেছিল আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখার জন্য। এ সবের যোগফল, একদিন অক্ষয়ের লোমশ বলিষ্ঠ বুকে ত্রিপর্ণা স্থান খুঁজে নিল। কিন্তু এটাও তো সেই সঙ্গে ঠিক, ত্রিপর্ণা বিশ্লেষণে যায়, সে সহজে অক্ষয়কে গ্রহণ করতে চায়নি। সুজয় তাকে যত অবহেলা করেছে, তত সে অক্ষয়ের দিকে একটু একটু করে সরে গিয়েছে। তা হলে কি সুজয়ের অত্যাচার ও কাপট্যের বিরুদ্ধে ত্রিপর্ণার প্রতিবাদের হাতিয়ার ছিল অক্ষয়? তাই হয়তো। বড় একটা নিঃশ্বাস ত্রিপর্ণার বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে।

আর শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না। খাট থেকে ত্রিপর্ণা নেমে আসে। বাইরে নিশুতি রাত ঝিমঝিম করছে। এখন কত রাত কে জানে! হয়তো দুটো। তিনটেও হতে পারে। ঘড়ি দেখবে না সে। কী হবে সময় মেপে! একটা রাতচরা পাখি কর্কশভাবে ডাকতে ডাকতে উড়ে যায়। প্যাঁচা হয়তো। হয়তো অন্য কিছু। জানালা দিয়ে এক ঝলক ভিজে শীতল বাতাস ত্রিপর্ণার মুখে চুলে আলগোছে আদর করে। চমকে মুখ তুলে ওপর দিকে চায় সে। মেঘের কোণা দিয়ে একাদশীর চাঁদ উঁকি দিয়েছে। চাঁদের ছায়ামাখা রুপোলী আলোর এমন রাতে স্বপ্ন দেখার ইচ্ছা হয়। ত্রিপর্ণা তো সেই স্বপ্নই সুজয়কে ঘিরে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু সে এমনই মানুষ, তাকে ঘিরে কোনও স্বপ্ন দেখতে দেয়নি তার বউকে। এমনই নির্দয়, হৃদয়হীন পুরুষ ছিল সে।

কিন্তু ওর ভাবনাটা বড্ড একপেশে হয়ে যাচ্ছে না তো? সুজয়ের পাষাণ-বুকের গভীরে কোথাও কি তার স্ত্রীর জন্য খানিকটা প্রেম লুকিয়ে ছিল না? দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলতে গিয়ে ত্রিপর্ণার মন অতীত হাতড়ে ফেরে।

না, স্মৃতির পাতা এখনও হলদে হয়ে যায়নি। একটা রাতের কথা ত্রিপর্ণার ভাবনায় উঠে আসে। সে রাতে দারুণ জ্বরের তাড়সে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ছিল। মাথায় হাতুড়ি পেটার কষ্ট। ডাক্তার এসেছিল। সুজয়ই ডেকে এনেছিল। ডাক্তার ওষুধ দিলেও ত্রিপর্ণা সারাটা রাত ছটফট করেছে। বিকারের ঘোরে সুজয়কে অনেক কটু কথাও বলে গেছে। সুজয় তবু ছিল তার পাশে সারা রাত অনিদ্র। সে ওর মাথায় বরফ দিয়েছে, বাতাস করেছে, জ্বর মেপেছে ঘন্টায় ঘন্টায়, ওষুধ দিয়েছে প্রহরে প্রহরে। ভোরের দিকে রোগিনীর ঘোর যখন কেটে গেছে, জ্বর নেমে এসেছে, তখন সে অপলক ভালবাসায় নিবিড় করে পেতে চেয়েছে নিশি জাগরণে শ্রান্ত তার স্বপ্নের মানুষটিকে। এ সময় সুজয়কে মনে হয়েছিল সেই প্রেমিক পুরুষ, যার প্রতীক্ষায় চিরন্তন নারী তার হৃদয় বিছিয়ে রাখে।

অতীতের ধুলো ঘাঁটতে গিয়ে আরও একটি ঘটনার কথা ত্রিপর্ণাব মনে ভেসে আসে। বিয়ের পর ও তখন থাকত শ্যামবাজারে ওর শ্বশুর বাড়িতে। শাশুড়ী ছিল বদরাগী। যখন তখন সামান্য ব্যাপার নিয়ে তাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করত। ওর বাবা মাকে জড়িয়ে পর্যন্ত ইতর ভঙ্গিতে যা ইচ্ছা তাই বলে যেত। মুখ বুজে সহ্য করত

ত্রিপর্ণা। প্রতিবাদ করেনি একটি দিনও। ওর কষ্ট হত খুব। সহ্য করতে পারত না এই মানসিক পীড়ন। ওর মনে হত যে কোনও দিন হয়তো সে ভেঙ্গে পড়বে। মনের এই অসহ্য দোলাচল অবস্থায় সে আশ্রয় খুঁজেছিল সুজয়ের কাছে। সুজয়ের সান্ত্বনা ও আশ্বাস ওকে ভরসা যোগাত, সাহস দিত। সুজয় সত্যিই ওর কষ্টটা বুঝেছিল। তাই অল্প দিনের মধ্যেই সে মাণিকতলা অঞ্চলে একটা দু-কামরার ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিল। নতুন সংসারের পত্তন হল ত্রিপর্ণাদের। আঃ সে কী দারুণ শান্তি আর সুখের সময়! কৃতজ্ঞ ভালবাসায় ত্রিপর্ণা সেদিন সুজয়ের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিল।

একাদশীর চাঁদ মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। আকাশে মেঘ নতুন করে জমাট বাঁধছে। আষাঢ় শেষে শ্রাবণের ধারা নামার প্রস্তুতি। ত্রিপর্ণা অন্ধকার আকাশে কিছু খুঁজতে থাকে। তারাহীন, চাঁদহীন নভোমণ্ডলে একটি মুখ কি ভেসে উঠেছে? সে কি ভোরের প্রতীক্ষায় থাকা সুজয়ের মুখ? হ্যাঁ, সেই মুখখানি তো সুজয়েরই। তবে প্রত্যূষের খোঁজে থাকা প্রেমিক সুজয় নয়, এ হল নিষ্ঠুর, নির্দয়, প্রাগৈতিহাসিক সুজয়। এ সুজয় ধর্ষকামী এক বর্বর পুরুষ, শুধুমাত্র বিকৃত পাপাচারে যে উল্লাস বোধ করে। এ সুজয় জানে না যে তার স্ত্রীর একটি মন আছে আর সেই মনে কষ্ট আছে। নির্যাতনে শরীরে যত কষ্ট পায়, মনে কষ্ট ভোগ করে তার বহুগুণ বেশি। এ সুজয় একান্তভাবে আত্মভোগী। প্রায় প্রতিটি রাতেই উৎকট আনন্দে উন্মাদ হয়ে যেত এই আদিম পুরুষ। এই মানুষকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল ত্রিপর্ণা, কিন্তু ভয় পেত সচেতন বোধে। শেষ পর্যন্ত সুজয়ের স্বার্থপর ভোগ-তাড়নার কাছে সে ছিল প্রাণহীন এক কাঠের পুতুল—উপায়হীনা, সম্বলহীনা, ধর্ষিতা ও অপমানিতা এক অসহায় নারী।

তাই কি অক্ষয় আসতে পারল তার জীবনে? আসবার সুযোগ করে দিল সুজয় নিজেই। না কি ত্রিপর্ণাই সুযোগ খুঁজে নিল? অক্ষয়ের চোখে যে ছিল বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতার সুস্পষ্ট আশ্বাস। ওর আচরণে নিরন্তর সাহচর্য ও মমতার প্রতিশ্রুতি সোচ্চার ছিল। তখন অবশ্য ত্রিপর্ণা বুঝতে পারেনি বন্ধুত্বের বিস্তৃত জাল পেতে অক্ষয় আসলে মাকড়সার মতো নিঃশব্দে অপেক্ষা করত কবে সে তার বাহুবন্ধনের শিকার হবে। যখন সুজয় উদ্দাম হত, হিংস্র থাবা বাড়িয়ে ত্রিপর্ণাকে নখরাঘাতে জর্জরিত করত, তখন ত্রিপর্ণার মনে হত সুজয়ের এই পুতুল খেলার সংসার ছেড়ে যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকেই সে চলে যাবে। এই সব সময়ে অক্ষয় একটু একটু করে ওর মনে আসা-যাওয়া শুরু করে। ত্রিপর্ণার ইচ্ছা হত অক্ষয়ের নিরুচ্চারিত আহ্বানে সাড়া দিতে। ওর এখন কিন্তু মনে হচ্ছে অক্ষয়ের চোখজোড়া আসলে অজগরের মতো ওকে নিরন্তর আকর্ষণ করত। সেই আকর্ষণের অমোঘ টানে সে এক সময় ধীরে ধীরে কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে ওর কাছে ধরা পড়ল।

অন্ধকার আকাশে সুজয়কে খুঁজতে গিয়ে তীব্র অভিমানে ত্রিপর্ণা ফুঁসে ওঠে। সে তো সত্যি সত্যিই সুজয়ের ভালবাসার কাঙাল ছিল। ছিল বলেই তো তার দেওয়া সব অপমান আর নির্যাতন মুখ বুজে মেনে নিয়েছিল। তবু সুজয় কেন অন্য নারী-সঙ্গ করত? অক্ষয় যখন এমন একটা সংবাদ প্রথম ত্রিপর্ণাকে দিয়েছিল,

ত্রিপর্ণা তখন হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল তার কথা। শুধু তাই নয়, মিথ্যাবাদী বলে সামান্য ছুতোতেই অক্ষয়কে বিদায় করে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে কি সত্য মিথ্যা হয়ে গেল? হয়নি। তাই দিনের পর দিন অক্ষয়ের মুখে সুজয়ের অন্য নারী সঙ্গের কথা শুনতে শুনতে, ত্রিপর্ণার মনে সন্দেহের বীজ ঢুকে গেল। শেষটায় সন্দেহ নিরসনের জন্য সে অক্ষয়ের সঙ্গে গেল। শুধু গেল না, নিজের চোখ দুটিকে অবিশ্বাস করেও দেখতে পেল শিয়ালদা অঞ্চলের একটি হোটেলে সুজয় একটা বেহায়া মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকছে আরও একদিন ত্রিপর্ণা দেখল তার সুজয় সেই বেহায়া মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের একটি পানশালায় হাসি মুখে বসে আছে।

সেই সময়টার কথা ভাবতে আজও ত্রিপর্ণার খুব কষ্ট হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি রাতই তখন ও বিনিদ্র কাটাত। কী এক অসহ্য যন্ত্রণায় ওর বুকের ভেতর রোড রোলারের পেষণ চলত। মনও থাকত ভয়ঙ্কর ভাবে বিক্ষত। ত্রিপর্ণার মনে পড়ছে ওই সময়ে সে রাগ করে আর সুজয়ের পাশে শুত না। ওকে প্রচন্ড ঘৃণা হত তার। অবশ্য এত রাত করে এমন অবস্থায় সুজয় তখন ঘরে ফেরা শুরু করেছিল, খেয়াল করত না কিছুই।

তবু একদিন শেষ রাতের দিকে সুজয়ের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। মাটিতে মাদুর পেতে ত্রিপর্ণা রোজকার মতই শুয়েছিল। ওর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভাঙ্গা বিস্ময় নিয়ে সেদিন ত্রিপর্ণা দেখেছিল পরম মমতা আর দু চোখ ভরা ভালবাসায় সুজয় ওর মাথায় হাত রেখে নিশ্চুপ বসেছিল। ত্রিপর্ণা সেদিন নিরুচ্চারে বলেছিল, এ তোমার কী রঙ্গ সুজয়? একদিকে অন্য নারীসঙ্গ করছ, অন্যদিকে অভিমানিনী স্ত্রীর ক্ষতে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছ। ত্রিপর্ণার হঠাৎ হাসি পায়। তখন যে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। সুজয়ের অবহেলা আর নিষ্ঠুর ঔদাস্য তার কাছ থেকে ধীরেধীরে তার স্ত্রীকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

অন্ধকার আকাশে চোখ স্থির রেখে ত্রিপর্ণা সুজয়ের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। সুজয়, আমি জানি অক্ষয় একটা ভণ্ড। আমার সামনে তুমি যখন ওকে গ্লাশে মদ ঢেলে দিতে, ও সরিয়ে দিত। বলত, বউদির সামনে এসব আমি ছোঁব না। প্রথমদিকে, আশ্চর্যের কথা, অক্ষয় আমাকে দেখলে উঠে দাঁড়াত, নমস্কার করত। আমার খুব ভাল লাগত অক্ষয়ের এই শিষ্টাচার। আজ কিন্তু ওর কোনও সৌজন্য অথবা ভদ্রতার বালাই নেই। সে এখন আমাকে দিয়ে গ্লাশে মদ ঢালিয়ে খাচ্ছে। আগে মদ খেত না বলতে গেলে। এ কদিন খাচ্ছে খুব। পেগের পর পেগ। মদের নেশায় আমাকে জড়িয়ে ধরে, আদর করে। সুজয় হবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। আসলে অক্ষয়ও আর স্বাভাবিক নেই। আতঙ্কে এবং অনুশোচনায় ভুগছে। তাই হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে হঠাৎ হঠাৎ।

আকাশে মেঘ জমেছে খুব। ত্রিপর্ণা মুখ বাড়িয়ে নিরীক্ষণ করে। নিকষ কালো আঁধারে চাঁদ সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে। ত্রিপর্ণার মনে হয় তার জীবনটাও যেন এমনি ঘন অন্ধকারের আড়ালে হারিয়ে গেছে। অনেক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে অক্ষয়ের হাত ধরে ও পথে নেমে এসেছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে মাত্র কটা দিনের মধ্যেই সে স্বপ্নের ফানুসটি ফেটে গেছে। ওর মন বলছে আর বেশি দিন ওড়িশার

এই নাতিখ্যাত শহরে লুকিয়ে থাকা যাবে না। এক্ষুনি যে ওরা ধরা পড়ে যাবে, তা অবশ্য মনে হয় না। তবে অক্ষয় হয়তো খুব তাড়াতাড়ি ওর কাছ থেকে সরে যাবে। অছিলাও তৈরি। ওকে একবার নাকি কলকাতায় যেতেই হবে। ঝুঁকি নিয়ে হলেও যেতে হবে। টাকা চাই, অনেক অনেক টাকা। সেই টাকা জোগাড় করতেই অক্ষয় যাবে। ব্যাঙ্কে ওর যা সঞ্চয় আছে তা তুলে নিতে হবে। ত্রিপর্ণার কিছু গয়নাও বিক্রি করতে হবে নতুন জীবনের পত্তনিতে। তাই অক্ষয় যাবে, কিন্তু ত্রিপর্ণা রয়ে যাবে এই গেস্ট হাউসে। দু জনে একসাথে গেলে নাকি ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় বহুগুণ বেশি।

আকাশের মুখে আলকাতরা রং নিপুণ হাতে লেপা হয়ে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে ত্রিপর্ণার ভাবনা দিশেহারা। তার আজকের এই পরিণতির জন্য দায়ী কে? সুজয়? অক্ষয়? নাকি সে নিজে? কতবার একই কথা তার মনে আসছে। কিন্তু ঠিক ঠিক উত্তর খোঁজা শেষ হয় না। একবার মনে হয় সে নিজেই দায়ী। তারপরেই মনে হয়, সে নয়, সুজয় বেশি দায়ী। সে তো অন্ধ ছিল না। সে কি বুঝতে পারছিল না তার বউ তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে? আর বুঝতেই যদি পেরেছিল বাধা দেয়নি কেন? কেন সুজয় নিজের স্ত্রী ও প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে এমন মারাত্মক খেলায় মাতল? এ কি ওর এক ধরণের আত্মরতি? কোনও ধর্ষকামী কি এমন মর্ষকামী আচরণ করতে পারে! ত্রিপর্ণার মনে হয়, সুজয় চরিত্রের এ এক নিষ্ঠুর বৈপরীত্য। ওর ভীষণ কান্না পেতে থাকে। সুজয়, তুমি কেন এমন খেলা খেলতে গিয়েছিলে? তুমি কি বোঝনি কী হতে চলেছে! এমন খেলায় যা হয়ে থাকে, তাই হয়েছিল। তোমার প্রতি ঘৃণা আর অভিমান নিয়ে তোমার বউ তোমারই চোখের ওপর দিয়ে অন্যের হয়ে গেল।

আকাশে আসন্ন দুর্যোগের ঘনঘটা। মেঘে মেঘে হুঙ্কার। অন্ধকার ছিঁড়ে ফেলা বিদ্যুতের আলোয় ত্রিপর্ণা নিজেকে চিনে নিয়ে নিস্তব্ধ চরাচরে মিশে যেতে চায়। এখন, রাত্রির এই অন্ধকারে, সে বেশ আছে। কেউ তাকে চেনে না। কিন্তু সকালের আলো ফুটলে তার পরিচয় হবে এখানে বেড়াতে আসা জনৈক অমল ঘোষের স্ত্রী অনসূয়া ঘোষ। হঠাৎ ত্রিপর্ণার দু চোখে বর্ষা ভাঙ্গে। ও সুজয়কে যেন একেবারে সামনেই দেখতে পাচ্ছে। তাই ওর সঙ্গে কথা বলে যায় নিজের মনেই।

সুজয়, তুমি আগুন নিয়ে খেলতে গিয়েছিলে। তুমি তো জানতে এ খেলা কত মারাত্মক। এ খেলায় ঘর পোড়ে, মন পোড়ে, শেষ পর্যন্ত জীবনটাই পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। হ্যাঁ সুজয়, চোখ মুখ বিকৃত করে রাগী মূর্তিতে শেষ পর্যন্ত যেদিন অক্ষয়কে তোমার ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে বললে, সেদিন বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল। তুমি খুবই বড় রেগে গিয়েছিলে। রাগ তো তোমার হবেই। এতক্ষণ যে তোমার বিছানায় তোমারই বউকে নিয়ে অক্ষয় শুয়েছিল। আগে কেন তোমার এমন রাগ হয়নি, সুজয়? তোমার এতদিনকার নিরাগ-নীরবতা অক্ষয়কে যে দুঃসাহসী করে দিয়েছিল।

ত্রিপর্ণার হঠাৎ হাসি পায়। গোড়া কেটে একেবারে শেষ অঙ্কে জল ঢালতে চেয়েছিল সুজয়। তাই যখন সে বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তুতি নিচ্ছে, অক্ষয়কেই জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছে, তখন সুজয় বেঁকে বসল। নাহ্ সে বিবাহবিচ্ছেদে রাজী

নয়। কিছুতেই সে ডিভোর্স দেবে না। প্রয়োজনে একেবারে শেষ পর্যন্ত লড়বে সুজয়, এতদিন তুমি শুধু চেয়েছিলে তোমার স্ত্রী এবং বন্ধু তোমারই অঙ্গুলি হেলনে খেলবে, নাচবে এবং সব সময় তোমার কৌতুকের জোগানদার হবে। এ কখনও হয় না সুজয়। অসম্ভব কিছু চেয়ে বসেছিলে। তাই খেলার শেষ দানে তুমি তোমার পর্ণাকে অক্ষয়ের আলিঙ্গনে আবদ্ধ দেখে চিৎকার করে উঠেছিলে অন্ধ আক্রোশে তাদের মিলন-আকাঙ্খাকে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে। তাই তীব্র বিদ্বেষে অক্ষয়ের দু গালে পরপর সজোরে চড় মারলে। আকস্মিক এই আক্রমণে প্রথমটা হতচকিত হলেও, অক্ষয় প্রত্যাঘাতে দেরি করেনি। দরজার খিলটা তুলে নিয়ে তোমার মাথায় তৎক্ষণাৎ সে প্রাণপণে আঘাত করে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মাথা থেকে। তুমি মাটিতে পড়ে গেলে। যন্ত্রণায় তোমার মুখ বিকৃত হয়ে পড়ে। এ সুযোগ অক্ষয় ছাড়েনি। পাশেই আলনাতে আমার শাড়ি-জামা ছিল। চকিতে একটা শাড়ি টেনে নিয়ে তোমার গলায় ফাঁসের মতো জড়িয়ে দেয় সে। আমি তখন দিশাহারা, হতভম্ব কী করব না করব ভাবতে ভাবতেই তোমার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এল। জিভও বেরিয়ে আসতে চাইল। ঠোঁটের কোণা দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ল। সদ্য কাটা মুরগির মতো একটু ছটফট করে তুমি একেবারেই শান্ত হয়ে গেলে।

এখন ভাবি সুজয়, সেদিন অক্ষয় অত জোর পেল কী করে। গলার ফাঁসে সামান্য আলগা দেয়নি সে। দাঁতে দাঁত চেপে তোমার মৃত্যুর প্রহরটাকে এগিয়ে এনেছে হ্যাঁ সুজয়, তোমার এই বীভৎস-করুণ পরিণতির জন্য আমিও কিছু কম দায়ী নই আমি অক্ষয়কে কোনও বাধা দিইনি। ভারী খিলটা তুলে নিয়ে তখন ওর মাথাটাও ভেঙ্গে দিইনি। অথচ খিলটা সামনেই পড়ে ছিল। কোনও চিৎকারও করিনি পাছে লোকজন ছুটে আসে। অক্ষয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমিও বারবার পরখ করে দেখেছি তোমার দেহে প্রাণটুকু ধুকপুক করছে কিনা। হ্যাঁ সুজয়, আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমি মহাপাতকী। আমি বিশ্বাসহন্ত্রী। এবং তোমার মৃত্যুর জন্য আমিও সমান ভাবে দায়ী। তাই আমারও আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। ত্রিপর্ণার দু চোখে লোনা সমুদ্রের ঢেউ উতরোল হয়।

কালো আকাশটাকে ফালাফালা করে বিদ্যুৎ চমকায় ঘনঘন। মেঘ ডাকছে সঘনে এই আলো-আধাঁরিতে জীবনটাকে দেখতে গিয়ে ত্রিপর্ণা মনে প্রাণে জানে সে কলকাতার জনৈক সুজয় নাগের সদ্য বিধবা স্ত্রী। যতক্ষণ অন্ধকার, ততক্ষণ সে তাই থাকবে। পৃথিবীতে আলো পড়লেই তার পরিচয় পাল্টে যাবে। সে তখন স্বামী-ঘাতিনী, অন্য পুরুষের কণ্ঠলগ্না এক নষ্ট নারী। এ পরিচয় সে না চাইলেও সারা পৃথিবী তাই জানবে। কাল বা পরশু অক্ষয় যখন টাকা আনবার নাম করে চলে যাবে, এবং আর হয়তো ফিরে আসবে না, তখন কি ত্রিপর্ণা তার আসল পরিচয়টুকু গোপন রাখতে পারবে? প্রথমটায় কিছুদিন হয়তো লোকে জানবে সে অনল ঘোষের পরিত্যক্তা স্ত্রী। আরও পরে তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাবে যাবেই। তাকে সবাই জানবে জঘন্য চক্রান্তকারী, দুশ্চরিত্রা এক খুনী আসামী বলে তার স্থান হবে জেলের নরকে। না হলে পতিতা পল্লীতে। সেই অগৌরব আর লাঞ্ছনার জীবন শুরু হবার আগে বর্তমান পবিচয়েই ত্রিপর্ণা এই পৃথিবী থেকে হঠাৎ

করে হারিয়ে যাক না! সেই তো বেশ হবে। ওই তো কাছেই বয়ে যাচ্ছে জিরা নদী। বর্ষার ভরা নদী এখন তীব্রস্রোতা। আজ বিকালেই ও আর অক্ষয় বেড়াতে গিয়ে দেখে এসেছে। ওখানেই ওর জন্য অপেক্ষায় আছে শীতল শান্তি।

আকাশের দিকে আবার চোখ ফেরায় ত্রিপর্ণা। মেঘের স্তর গভীর জমাট। বৃষ্টি নামবে যখন তখন। নিশীথ যামিনী নিঃসাড়। প্রকৃতি যেন তারই প্রতীক্ষায়। নাহ্, আর দেরি করা নয়। অক্ষয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেলে ওর আর যাওয়া হবে না। এমন চমৎকার শান্তির পরিমণ্ডল হারিয়ে যাবে।

আস্তে ঘরের দরজা খোলে ত্রিপর্ণা। প্যাসেজে আলো জ্বলছে। জ্বলুক। কেউ তাকে দেখবার জন্য রজনীর এই প্রহরে জেগে নেই। সদর দরজা বন্ধ। ধীর হাতে ত্রিপর্ণা দরজা খোলে। বেরিয়ে কী আরাম। কী দারুণ স্বস্তি। সমুখেই চিরশান্তির হাতছানি। জিরা নদী দু হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকছে। বিদ্যুতের আলোয় পথ চিনে চিনে ত্রিপর্ণা হাঁটতে থাকে।

নদী এসে যায়। দুকূল ছাপানো দুরন্ত পাহাড়ী জলের ঢল নেমেছে। অন্ধকারেও বেশ বোঝা যায় পাক খেতে খেতে তীব্র বেগে ছুটে চলেছে উন্মত্ত জলধারা। নদীর ওপর লোহার সেতু। সেতুর মাঝ বরাবর এসে থমকে দাঁড়ায় ত্রিপর্ণা। একবার মনে করে ফিরে যায়। পরক্ষণেই মনে হয় কেন ফিরবে? কোথায় বা ফিরবে? তার কাছে জীবন মানে তো আনন্দহীন, আশাহীন একটা অস্তিত্বের বোঝা শুধু। অন্যদিকে সামনে অনন্ত মুক্তি, শীতল শান্তি। জলের দিকে চায় ত্রিপর্ণা। ওইতো ওখানে সুজয়ের মৃত্যুহিম মুখখানা ভাসছে। ওর চোখ দুটো কোটর ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, জিভ ঝুলে পড়েছে, কষে শুকনো লালার দাগ।

ঝপ করে ভারী কিছু জলে পড়ার শব্দ হয়। একটা ঘূর্ণি ওঠে। তারপরই আদিগন্ত জুড়ে বাতাস ঝোড়ো হয়ে ওঠে। শুরু হয় অশ্রান্ত বর্ষণ।

পুতুলের প্রাণ

দত্ত সাহেব আসছেন না! খোলা ফাইলের ফাঁক গলে চশমার আড়াল ভেদ করে পূরবীর চোখ যায় সামনের দিকে। হ্যাঁ, দত্ত সাহেবই তো। এখনও তেমনি হাঁটার ভঙ্গি। ঘাড় সোজা, বুক টান, সারা মুখে এঁটে বসা প্রসন্ন ভাব। তবে চেহারাতে বয়স ধরে ফেলেছে। মাথা ভর্তি সেই ঘন কালো চুল আর নেই, পাতলা হয়ে গেছে অনেকটাই। কপালটা চওড়া হতে হতে ব্রহ্মতালুর দিকে ছুট লাগিয়েছে। রগের ঘন চুলে সাদা কালোর গঙ্গা-যমুনা। এই হল ঘরটায় দাঁড়িয়ে সব দেখা যাচ্ছে। দেখছে পূরবী।

পূরবীর মনে পড়ে ওর চাকরি জীবনের শুরুতে এই অফিসেই দত্ত সাহেবের অধীনে একটানা পাঁচ বছরের বেশি সে কাজ করেছে। প্রথমটা সে কাজকর্ম কিছুই জানত না, একেবারেই নভিস। দত্ত সাহেবই তাকে বলতে গেলে কাজ শিখিয়েছি৻ সস্নেহে ভুলগুলো শুধরে দিয়েছেন। আর শুধু কি এটুকু? তার ব্যক্তিগত অসুবিধার সময়েও নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এদিকে তার নিজস্ব অসুবিধা তো লেগেই ছিল। ছিল কেন, এখনও আছে। তবে এখন আর অফিসে দত্ত সাহে৻ মত কেউ নেই, পূরবীকেই নিজের সমস্যা সামলাতে হয়। আসলে দত্ত সাহেব ছিলেন সত্যিকারের একজন দরদী মানুষ। পূরবী একা নয়, সে আমলের নতুন-পুরনো সব কর্মচারীই একই কথা বলত।

সেই দত্ত সাহেব এতদিন পরে তাদের অফিস ঘরের পাশেই দাঁড়িয়ে পড়েছেন কথা বলছেন কোনও চেনা মানুষের সঙ্গে। এখন পূরবী তাঁর সঙ্গে দেখা করবে না, তা আবার হয় নাকি! ফাইলটা বন্ধ করে, চেয়ারটা হাতের ঠেলায় পেছনে সরিয়ে সে অফিস ঘরের বাইরে আসে। সামনেই সিমেন্ট বাঁধানো টানা প্যাসেজ চলে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে দপ্তরের বড়-মেজ-সেজ সাহেবরা এই প্যাসেজ ধরে বাড়িটার অপর প্রান্তে তাঁদের বড়-মাঝারি-ছোট চেম্বারগুলোতে যান। প্যাসেজে পা দিতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস পূরবীর মুখে লাগে। আঃ কী ফ্রেশ বাতাস! ময়দানের সবটুকু খোলা সবুজ গায়ে মেখে এই বাতাস এসেছে। সামনেই দত্ত সাহেব। ময়দানের সবুজ মাখা বাতাসের মতই সস্নেহ।

—স্যার, পূরবী পায়ে হাত দেয়, কেমন আছেন? কোথায় আছেন এখন?

--পূরবী! তুমি আমাকে কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করলে কেন? তুমি কি জানন৷ আমি চার বছর হল রিটায়ার করেছি? তবে হ্যাঁ, রিটায়ার করলেও দিব্যি আছি আর আছি আমাদের সেই পৈতৃক বাড়িতেই।

—আমি জানি স্যার, আপনি রিটায়ার করেছেন। তবে রিটায়ারমেন্টের পরে৻ তো আপনারা অনেকে অনেক কাজে থাকেন। আমি ভাবলাম, আপনি সে রক৻ কিছুতে আছেন।

—ঠিকই বলেছ। আমিও ছিলাম কিছুদিন, তবে এখন আর কোথাও নেই পূরবীর কুণ্ঠিত মুখের দিকে তাকিয়ে দত্ত সাহেব সশব্দে হাসেন।—তোমরা কে কেম৻

আছ বলো। আগে তোমার কথা—তুমি কেমন আছ?

—ভালই। এখানে কোথায় এসেছেন, স্যার?

—এসেছিলাম তোমাদের সেক্রেটারির কাছে। একটা কাজ ছিল। ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে থাক, জগন্নাথবাবু কেমন আছেন?

—জগন্নাথদা তো আমাদের অফিসে আর নেই, গত বছর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হয়ে ফাইনান্সে চলে গেছেন।

—তাই নাকি? ভাল খবর।

দত্ত সাহেব পরিচিত আরও কজনের খবর নিতে নিতে লক্ষ করেন, পূরবীর সিঁথি আগের মতই সাদা। ওর চেহারাতেও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে তা ওর মুখে। সাদাসিধে মুখটাতে বয়স আর অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে গেছে।

—তোমারও তো অনেক দিন চাকরি হয়ে গেল।

—তা হল স্যার, এই জুলাইতে পনেরো বছর পূর্ণ হবে।

—তার মানে তোমারও একটা প্রমোশন ডিউ হয়েছে।

সলজ্জ হাসে পূরবী। —বোধহয় হচ্ছে স্যার।

—গুড, আগাম অভিনন্দন। তোমরা কি সেই বাড়িতেই এখনও আছ? অতসী না কি যেন হাউজিংটার নাম?

—'অতসী'ই। এত দিন পরেও আপনার ঠিক মনে আছে তো!

—থাকবে না! কতদিন অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে তোমাদের হাউজিং-এ গেছি না? তোমার সঙ্গে তোমার মা আছেন নিশ্চয়?

—আছেন স্যার, আপনার কথা আমার সব মনে আছে। সে সব কথা কি ভোলা যায়?

—তোমাদের সঙ্গে আরও কেউ থাকে নাকি? নাকি আগের মতোই তোমরা মা আর মেয়ে দুজনই থাক?

পূরবী আবার হাসল। —আর কে থাকবে, স্যার?

হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভাবে দত্ত সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের সেকসনে সুনীল কাজ করত না? সুনীল দেব রায়?

দিনের এত আলোতেও অন্ধকার নেমে আসে পূরবীর মুখে। সে কয়েক মুহূর্ত উত্তর দেয় না। তারপর বলে, হ্যাঁ, স্যার। রাইটার্স থেকে বদলি হয়ে এসেছিল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। সে এখন কোথায় আছে?

—সম্ভবত বিকাশ ভবনে। হায়ার এডুকেশনে হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল।

—সম্ভবত বললে কেন? তোমার সঙ্গে ওর দেখা টেখা হয় না? তোমাদের যোগাযোগ নেই এখন?

পূরবী নিরুত্তর থাকে। ওর মুখটা কঠিন হয়ে যায়। বিষাক্ত কোনও কিছুর দংশন জ্বালা ও যেন নীরবে সহ্য করছে। সে সব কিছু খেয়াল না করে দত্ত সাহেব প্রশ্নটা আবার করায় সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় পূরবী, না।

না। দত্ত সাহেবের মনে একটা ধাক্কা লাগে। ওঁর যতদূর মনে পড়ছে পূরবী আর সুনীল খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। এই অফিস থেকে চলে যাবার মুখে মুখে ওঁর কানে যে

খবরটা পৌঁছয়, তাতে তিনি ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। সুনীল নাকি পূরবীকে বিয়ে করছে। পূরবীর মতো ছোটখাটো ময়লা রঙের একটা শান্তশিষ্ট মেয়েকে সুনীলের মতো ছেলে যদি সত্যিসত্যিই বিয়ে করে, তবে তো বুঝতেই হবে ওর বুকের খাঁচায় যে হৃদয়টা আছে তার মাপ আকাশের মতো। বিশেষ যখন সুনীল খুব ভাল করে জানে, আর পাঁচটা মেয়ের মত পূরবী সুস্থ-স্বাভাবিক নয়। পোলিওর মারণ ছোবলে ওর বাঁ পা-টা ছেলেবেলা থেকেই পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। পূরবী তাই শক্ত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ওর চাই অবলম্বন। তাই সে পেতে চেয়েছিল সুনীলের মধ্যে। কিন্তু দু জনের বিয়েটা হয়নি যে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু বিয়ে তো হবারই কথা ছিল। অফিসের সবাই তাই জানত। তিনিও তেমনই জানতেন। মনে হচ্ছে কোথাও একটা গণ্ডগোল ঘটে গেছে। দত্ত সাহেবের খারাপ লাগে। ওঁর মনে হতে থাকে ভুল বোঝাবুঝির মূলটা ধরে টান দিতে পারলে ওরা দুটো প্রাণ নিশ্চয় আবার এক হয়ে যাবে। তিনি একবার চেষ্টা করবেন না কি? রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কথা পূরবীর সঙ্গে আলোচনা করা যায় না। চারপাশে অনেক মানুষ জন।

—তুমি অফিস থেকে বাড়ি ফের কখন? সাতটার মধ্যে নিশ্চয়?

আগেই ফিরি স্যার। আরও আগে ফিরতাম, যদি বাসটাসগুলো ঠিক সময়ে পাওয়া যেত।

—অফিস ছুটি হবার খানিকটা আগেই চলে যাওনা কেন? তুমি চাইলেই এ জন্য পারমিশান নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে।

—আমি তো স্যার, ছুটির আগেই চলে যাই। আপনার আমল থেকেই সুবিধাটা পেয়ে যাচ্ছি। তবে অফিসে আসবার সময় কিন্তু দেরি করি না। বরং বেশ খানিকটা আগেই এসে চাই। লজ্জা লজ্জা হাসি হাসে পূরবী।

—আগে এসে ভালই কর। অফিস টাইমের ভিড়ে তোমার পক্ষে বাসে ওঠা বেশ কঠিন। বিশেষ তুমি তো আবার মাঝপথ থেকে ওঠো। তখন সিট পাওয়াও দুষ্কর।

চশমার পিছনে পূরবীর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে। —আমি, স্যার, মোটামুটি রোজই বসার জায়গা পেয়ে যাই। লেডিজ সিট খালি না থাকলে প্রতিবন্ধীদের সিটটা পাই। সেটা না পেলেও দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। কেউ না কেউ তার জায়গাটা আমায় ছেড়ে দেয়। আমায়, স্যার, মানুষজন সব সহানুভূতির চোখে দেখে। আমার মতো প্রতিবন্ধীদের এদিক দিয়ে খুব সুবিধা, না স্যার?

দত্ত সাহেব চমকিত হন। তাঁর মনে হয় পূরবীর কথায় সত্যি ছাড়াও আরও কিছু যেন আছে। নিজের পঙ্গুত্বের জন্য চাপা ক্ষোভ এবং অভিমান! কিন্তু এই মেয়েটিই যখন চাকরি নিয়ে এই অফিসে প্রথম এল, তখন দত্ত সাহেব ওর কপালের ভাঁজে আত্মপ্রত্যয়ের সুস্পষ্ট ছাপ দেখেছিলেন। সেজন্যই বোধহয় প্রতিবন্ধী কোটায় চাকরি পেলেও অফিসের কাজে ওর যোগ্যতা প্রমাণের আন্তরিক চেষ্টা ওকে সব সময় বিশিষ্ট করে তুলত। সে সময় কোনওদিন অফিস ছুটির আগে সে বাড়ি যেতে চাইত না। দত্ত সাহেব বললেও যেত না। হেসে বলত, প্রতিবন্ধী বলে চাকরি পাবার আসল সুবিধাটাতো নিয়েছি। এরপর আবার সব কিছুতেই সুবিধা নেব কেন? ওর

আত্মমর্যাদা দেখে সন্তুষ্ট দত্ত সাহেব প্রায়ই বাড়ি ফেরার পথে ওকে গাড়িতে তুলে নিতেন। ও আপত্তি করলেও শুনতেন না। এই মেয়েটা সে সময় ওর দৈহিক ত্রুটিকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছিল। আর সেটাই দত্ত সাহেবকে মুগ্ধ করেছিল। আজ এতদিন পরে সেই চ্যালেঞ্জ নেওয়া মেয়েটার চোখেমুখে হেরে যাওয়া একটা মানুষের ক্লীষ্ট ছায়া দেখে দত্ত সাহেবের খুবই খারাপ লাগতে থাকে।

তোমরা—অতসীতে তো? আগের ব্লকেই আছ 'K- ব্লক না?'

পূরবী মাথা নাড়ে, হ্যাঁ স্যার।

—তোমাদের ফ্ল্যাটটার নাম্বার তো k-10? তিন তলায়?

পূবরী বিস্মিত হয়। —আপনার দারুণ মেমরি, স্যার। ফ্ল্যাট নাম্বারটা পর্যন্ত ঠিক ঠিক মনে রেখেছেন।

দত্ত সাহেব স্মিত হাসেন। —মনে থাকবে না কেন? 'অতসী'র গেট থেকে একদিন— দুদিন নয়, বহুদিন তুমি আমায় তোমাদের ওই ফ্ল্যাটটায় ধরে নিয়ে গেছ। তখন তুমি নিয়ে গিয়েছিলে, এবার আমি নিজেই একদিন তোমাদের বাড়িতে যাব। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসব। যে কোনও দিন সন্ধ্যার পর যদি হাজির হই, আপত্তি করবে না তো?

—কী যে বলেন, স্যার! আপনি আমাদের বাড়িতে আসবেন, সে তো আমাদের সৌভাগ্য।

বিপ্লব বাবু দত্ত সাহেবকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। পূরবীকে ছেড়ে তার সঙ্গে দত্ত সাহেব কথা বলতে শুরু করেন।

'অতসী' আবাসনের কে-১০ নম্বর ফ্ল্যাটে তখনও আলো জ্বলেনি—কলিং বেল বেজে উঠল। পুরনো রং জ্বলা একটা ম্যাক্সি পরেছিল পূরবী। অশক্ত বাঁ পা টাকে টানতে টানতে দরজা খুলে সে অবাক হয়ে দেখল বাইরে দাঁড়িয়ে দত্ত সাহেব মুচকি মুচকি হাসছেন।

—স্যার, আপনি!

—আমি তো আসব বলেছিলাম।

—আসুন, আসুন স্যার, ঘরের আলো জ্বালিয়ে দেয় পূরবী।

—তোমার মা আছেন তো?

—হ্যাঁ, স্যার। আপনি বসুন, আমি মাকে ডাকছি।

দত্ত সাহেবের সামনে থেকে সরে গিয়ে পূরবী হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। যা সাজ-পোশাক ওর, তাতে কোনও ভদ্রলোকের সামনে যাওয়া যায় না।

একটু পরেই পূরবীর মা এলেন। অনেক দিন পরে দত্ত সাহেবকে দেখে তিনি খুবই প্রীত হন। —আপনি মনে করে যে আমাদের বাড়িতে এসেছেন, খুব ভাল লাগছে। বহুদিন পরে এলেন না? কত বছর পরে?

—তা অনেক বছর হল। দশ বছর তো বটেই। বেশিও হতে পারে।

—আপনারা সবাই ভাল আছেন তো?

—হ্যাঁ, বেশ আছি। আমি কিন্তু এতদিন পরে এই পুরনো ফ্ল্যাটটাতে আপনাদের

আশা করিনি।

—কোথায় আর যাব বলুন? সরকারি ফ্ল্যাট—যতদিন মেয়ের চাকরি আছে ততদিন হয়তো এখানেই থাকতে হবে।

দত্ত সাহেব একটু ইতস্তত করেন। কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা। কিন্তু যে কথ জানতে এসেছেন তা জানতে গেলে একটা ভূমিকা তো করতেই হয়। তিনি বলেন আমি ভেবেছিলাম পূরবীর বিয়ের পরে আপনারা হয়তো নতুন কোনও বাড়িতে চলে গিয়েছেন।

পূরবীর মায়ের শীর্ণ-মুখে যন্ত্রণার ছাপ ফুটে ওঠে।—না, ওর আর বিয়ে হল কই! ওই পঙ্গু মেয়েকে কে আর বউ করে ঘরে নিয়ে যাবে বলুন? তার ওপর আবার অত হাড় জিরজিরে চেহারা। খেতে চায় না মোটে। পাখির আহারও ওর চেয়ে বেশি।

—কিন্তু ওর তো একটা স্থায়ী সরকারি চাকরি আছে। মাইনে পত্তরও আজকাল বেশ ভাল হয়েছে। প্রমোশনও হবে। তাই বিয়ের বাজারে ও-তো মোটেই ফেলে দেবার মতো পাত্রী নয়।

—জানিনা আপনার কথা কতটা সত্যি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও চেষ্ট করেছিলাম। কিন্তু হয়নি।

—একবার হয়নি তো কী হয়েছে? আবার বিজ্ঞাপন দিন। প্রথম বারে কাজ হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার বিজ্ঞাপনে কাজ হয়েছে এমন দু-তিনটি কেস আমি জানি।

পূরবীর মা হতাশ ভাবে মাথা নাড়েন। —হবে না। ওর হবে না!

—এমন কথা বলছেন কেন? কেন পূরবীর কিছু হবে না?

—হবে না কারণ বিজ্ঞাপনের ফলে অনেক প্রস্তাব আসা সত্ত্বেও কোনওটাই তো লাগল না।

—পূরবীর অসুবিধার দিকগুলো বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন তো?

—তা তো দিয়েইছিলাম। ওর সম্বন্ধে সব কিছু জেনে বুঝে অনেকেই মেয়েকে দেখতে এসেছিল। অবশ্য মেয়ে দেখার পর বেশির ভাগই পরে জানাব বলে আর কিছু জানায়নি। তার মানে আমাদের ঘর-বাড়ি, মেয়ে-এ সব ওদের পছন্দ হয়নি দুটি ক্ষেত্রে অবশ্য পাত্র পক্ষ বিয়েতে রাজি ছিল। পাত্র দুটিরই আয় কম। ওরা দুজনেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। চাকরিও আজ আছে, কাল নেই গোছের। পঙ্গু হোক, কালো হোক, রোগা হোক, স্থায়ী সরকারি চাকরি করা মেয়ে ওরা লুফে নিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটাও টিকল না।

—কেন টিকল না?

পূরবীর মা হঠাৎ কথা বলতে পারেন না। একটু চুপ করে থেকে হতাশ বললেন, দুটোর কারণ দু'রকম। তবে আসলে আমারই জন্য কোনওটা হল না, দত্তবাবু।

—সে আবার কি! কেন আপনি কি করে ছিলেন?

পূরবীর মায়ের মুখে প্রকট হওয়া একটা অসহায়তার ছাপ দত্ত সাহেবের

এড়ায় না। —একটা পাত্র পক্ষ পুর্বীকে নিতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে ফেউ-এর মতো তার মাকে নিতে একেবারেই গররাজি। শাশুড়ি সঙ্গে থাকলে নাকি জামাই-এর সংসারে অশান্তির চরম হয়। আমি তাও মত করেছিলাম, কিন্তু মেয়ের একই কথা। তার মাকে একলা ফেলে অন্য কোথাও যাবে না। স্বামীর ঘর হলেও না।

দত্ত সাহেব মাথা নাড়েন। —আপনার মেয়ে তো মেয়ের মতোই কথা বলেছে।

—আসলে, দত্তবাবু, পুর্বীর প্রাণে খুব মায়া। ও বেশ ভাল করেই জানে, আমাকে ও আশ্রয় না দিলে আমার সত্যিই আর কোথাও ঠাঁই নেই। পূরবীর মা নিজেকে সামলাতে দেওয়ালে ঝোলানো অসুর বিনাশরতা দুর্গার ছবিওলা ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

—দ্বিতীয় পাত্রের বেলায় নিশ্চয় এ সমস্যা ছিল না। তা সেটি হল না কেন? দত্ত সাহেব সরাসরি জানতে চাইলেন।

—সেটির বেলায় সমস্যা একদম উল্টো। ছেলেটি তার মাকে নিয়ে কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রিতের মতো থাকে। ছোট্ট এক চিলতে ঘরে মা-ব্যাটার সংসার। ওদেরই থাকবার জায়গা নেই, তা বউ তুলবে কী! ওরা চেয়েছিল পূরবীর এই ফ্ল্যাটেই মা-ব্যাটায় থাকবে। দেখছেনতো, কত ছোট্ট এই ফ্ল্যাটটা। দুটো মাত্র পায়রার খোপ। এরঁ মধ্যেই খাওয়া-শোওয়া সব কিছু। এখানে কি দুটো পরিবার এক সঙ্গে থাকতে পারে? ছেলে তাই চাইল আমি অন্যত্র সরে যাই। আমার মেয়ে বেঁকে বসল। ফলে কেঁচে গেল এ প্রস্তাবও।

পূরবী আসে। শাড়ি পরে আসায় ওর পরিচিত চেহারাটি ফুটে উঠেছে। ছোট নিচু টেবিলটা সামনে টেনে এনে তার ওপর চা রাখে। ওই সঙ্গে ডিমে ডোবানো পাঁউরুটির টোস্ট।

—খান স্যার। এক্ষুনি ভেজে আনলাম। লজ্জিত মুখে তারপর যোগ করে, ঘরে মিষ্টি-টিষ্টি কিছু নেই।

—এতো সব আবার করতে গেলে কেন? একটু চা হলেই হতো। সঙ্গে না হয় দু খানা বিস্কুট, না হলে একটু মুড়ি দিতে। বুড়ো হয়েছি না, ভাজাভুজি খাওয়া বারণ।

—আপনি আবার বুড়ো কোথায় হলেন? মেয়ে ভেজে এনেছে, দু খানা অন্তত খান।

দত্ত সাহেব আর আপত্তি করেন না। টোস্ট তুলে নেন। চা খেতে খেতে গল্প হয়। এটা-ওটা কথা। তাঁর আমলে অফিসের হালচালের কথা। কথার ফাঁকেই দত্ত সাহেব সুনীলের প্রসঙ্গ তোলেন। —সুনীল আজকাল কোথায় থাকে, তুমি জানো?

প্রশ্ন শুনে পূরবীর চোখ দুটো যে জ্বলে উঠল দত্ত সাহেব তা খেয়াল করেন না।

—না। পূরবীর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—আগে তো সি আই টি কোয়ার্টার্সে থাকত। সে বাড়ি কি পাল্টেছে?

পূরবী চুপ করে থাকে। দত্ত সাহেব কি ওর কথা বিশ্বাস করেননি? জেরা করছেন তাই? উত্তর দিতে সে সময় নেয়। —সে বাড়িতে বোধহয় থাকে না।

—তোমাদের মধ্যে কি একেবারেই যোগাযোগ নেই?

উত্তর দেয় না পূরবী। সে চুপ করে থাকে।

—তোমাদের দুজনের বিয়ে হবে বলে একটা কথা আমি তোমাদের অফিস ছাড়ার আগেই শুনেছিলাম। কথাটা বোধহয় নিতান্তই রটনা। তাই না?

এ প্রশ্নেরও উত্তর দেয় না পূরবী। সে মাটিতে চোখ রেখে বসে থাকে। মাথা নিচু করে বসে থাকা প্রতিবন্ধী মেয়েটির মুখ দেখে দত্ত সাহেবের মায়া হয়। তিনি বুঝতে পারেন ওর ভেতরটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। ওঁর ভীষণ খারাপ লাগে। থাক সুনীল প্রসঙ্গ। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না তিনি।

কিন্তু কথা বললেন পূরবীর মা। —দত্তবাবু, আপনি ঠিকই শুনেছিলেন। সুনীল সত্যি সত্যিই পুর্বীকে বিয়ে করবে বলে জানিয়েছিল। ও তখন প্রায়ই আসত আমাদের বাড়িতে। রাত্রে একেবারে খাওয়া-দাওয়া করে যেত।

বিয়ে হল না কেন তবে? দত্ত সাহেব জিজ্ঞাসা করেন।

—বিয়ে হয়নি তা ঠিক নয়। 'রেজিস্ট্রি' করে দুজনের বিয়ে হয়েছিল। রেজিস্ট্রার এখানেই এসেছিলেন। সুনীলের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবও এসেছিল ক'জন।

—তারপর?

—কাগজে সই করলেও ওদের সেদিন সামাজিক বিয়ে হয়নি। তবে ছেলে-মেয়ের আশীর্বাদ পর্ব সেদিনই সারা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল পরে এক সময় শুভ দিন দেখে ওদের সামাজিক বিয়েটা হবে। কিন্তু সে বিয়েটা আর হয়নি।

—সামাজিক বিয়ে কোনও জরুরি ব্যাপার নয়। এ বিয়ে না হলেও ওরা স্বামী-স্ত্রী। ওরা অনায়াসেই স্বামী—স্ত্রী সম্পর্কে সংসার করতে পারে। সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

—আপনি ঠিকই বলছেন, দত্তবাবু। কিন্তু ওদের দুজনেরই ইচ্ছা ছিল একটা বিয়ের দিন দেখে পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করে বিয়ে করে। তারপর সংসার। আসলে বিয়েতে শাঁখ বাজবে, উলু হবে, টোপর পরে বর আসবে, কনে বেনারসীতে সাজবে, সাতপাক শুভদৃষ্টি হবে —এ সবই ছিল দুজনের ইচ্ছে। সেজন্যই রেজিস্ট্রি বিয়ে হলেও ওরা কখনও স্বামী স্ত্রীর মতো ঘর করেনি। আমরা দু পক্ষই ওদের ইচ্ছেতে সায় দিয়েছিলাম।

—ঠিকই করেছিলেন। কিন্তু সে বিয়ে কি হয়নি, মিসেস মাইতি?

পূরবীর মা বিচিত্র মুখভঙ্গি করেন। —না, সে বিয়ে আর হল না।

—সেকি! কিন্তু হলনা কেন?

—কী জানি। কী যে হঠাৎ হল হতভাগার। আশীর্বাদের মাস দুয়েকের মধ্যেই সে পুর্বীকে এড়িয়ে যেতে লাগল। গোপনে গোপনে ধরাধরি করে এক সময় অন্য অফিসে বদলিও নিয়ে নিল। শেষ কালে এমন হল, পুর্বী কথা বলতে গেলেও এড়িয়ে যেত। ওর অফিসে ফোন করলে ফোন ধরত, কিন্তু পুর্বীর গলা পেলেই সে ফোন নামিয়ে রাখত। অবস্থা এমন হয়েছিল যে হতভাগী মেয়েটার মুখের দিকে আমি আর চোখ তুলে চাইতে পারতাম না।

—শুনতে শুনতে ভেতরে ভেতরে দত্ত সাহেব রাগে ফুটছিলেন। —মিসেস

মাইতি, সুনীল এমন ভাবে দায় এড়াতে পারে না। পূরবীর সঙ্গে ওর তো স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুয়ায়ী বিয়ে হয়েছিল।

পূরবীর মা মাথা নাড়েন। —তাতো হয়েছিল। কিন্তু কেন ও রেজিস্ট্রি বিয়েটা করতে গেল সেটা এখনও একটা রহস্য। ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে পরে নিশ্চয় ওর আপসোস হয়েছিল। ওর হয়তো মনে হয়েছিল পুর্বীর চেয়ে অনেক ভাল মেয়ে সে বিয়ে করতে পারে। হয়তো অন্য কোনও মেয়ের ফেরেও পড়ে গেছিল। আমার মেয়ে তো খুবই সাধারণ, তার ওপর কমজোরি। ঘোর প্যাঁচ বুদ্ধিও কিছু নেই। ঢং-ঢাং, ছলাকলাও শেখেনি। এমন একটা মেয়েকে সহানুভূতি দেখানো যায় দত্তবাবু, করুণা করা যায়, বাসে-ট্রামে বা রাস্তায় সাহায্যও করা যায়, কিন্তু স্ত্রীর সম্মান দিয়ে ঘরে তুলে নিয়ে যাওয়া যায় না। তা করতে গেলে বুকের যে পাটা থাকা দরকার, নিশ্চয় তা সুনীলের ছিল না। আপনার নিশ্চয় মনে আছে সুনীল ভাল অভিনয় করতে পারত। অফিসের হয়ে এবং পাড়ার ক্লাবে ও নাটক করত। কিন্তু নাটকটা যে পুর্বীর মতো হতভাগীর সঙ্গেও করছে, তা আমরা কোনওদিনও বুঝতে পারিনি। যখন পারলাম, ততদিনে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। তাই নানা বাহানায় আরও কিছু সময় কাটিয়ে সে একদিন ওদের বিয়েটাকে কোর্টের মাধ্যমে বাতিল করতে চাইল। আমার মেয়ে প্রথমটায় এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি। কিন্তু যখন বুঝল জোর করে ভালবাসা পাওয়া যায় না, তখন সে মত দিল। না দিয়েই বা ওর কী করার ছিল। মিছিমিছি কোর্ট-কাছারিতে হয়রাণ হতে হত। আর শেষ পর্যন্ত মামলা জিতলেও সুনীল ওকে নিয়ে ঘর করত না। অশান্তির একশেষ করে ছাড়ত। যা সাঙ্ঘাতিক ছেলে ও। ও সব কিছু করতে পারে। এমন লোকের বিরুদ্ধে আমরা কীই বা করতে পারতাম? বুদ্ধি-পরামর্শ দেবার মতো এবং দৌড়োদৌড়ি করবার মতো আমাদের কেউ নেই। না, ভগবানও আমাদের সহায়তা করেননি। করলে পুর্বীর জীবনটা এমন অভিশপ্ত হয়ে যেত না। সেই দারুণ দুঃসময়ে পুর্বী কিন্তু বারবার আপনার কথা বলত। বলত, দত্ত সাহেব থাকলে কিছুতেই ওর জীবনটা এমন তছনছ হয়ে যেত না। সবই আমাদের মন্দ ভাগ্য, দত্তবাবু।

দত্ত সাহেব নিথর বসে শোনেন। ওঁর মনে হয় পূরবী বিয়ে বাতিল করার প্রস্তাবে মত দিয়ে ঠিক কাজই করেছে। ওদের মধ্যে তো বিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও আর ছিল না। আর বিশ্বাস না থাকলে ভালবাসাও থাকে না। এখন পরিষ্কার, সুনীল পূরবীকে কোনওদিনই যে ভালবাসত না এতে কোনও সন্দেহ নেই। ওকি তাহলে প্রথম থেকেই ভালবাসার অভিনয় করত? কিন্তু কেন করত? সে কি কেবল মাসান্তে পূরবীর মাইনের টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে? না অন্য কিছুর লোভে? উদার সাজার মোহে কি! হয়তো এ সব কিছুই নয়, সে পূরবীকে নিয়ে শুধুই খেলত। নিছক মজা পেতেই খেলত। নাটকের অভিনয়ের মতো ওর কাছে এটাও ছিল আর একটা অভিনয়-অভিনয় খেলা। দম দেওয়া পুতুল নিয়ে খেলার মতো অনেকটা। পূরবী যে পুতুল নয়, একটা আস্ত মানুষ, যে ব্যথা-বেদনায় কষ্ট পায়, ভালবাসায় রঙীন হয়, সে খেয়াল বোধ হয় নাটক করা শয়তানটার ছিল না। থাকলে একটা সরল মেয়ের জীবন নিয়ে ও এমন করে ছিনিমিনি করত না। সত্যিই সুনীলটা মানুষ নয়, মানুষের

চামড়া মোড়া একটা জানোয়ার। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের কাছে পৃথিবীতে এম জানোয়ারদেরই রমরমা বাড়ছে। মানুষগুলো সব খুন হয়ে যাচ্ছে। দত্ত সাহেবে মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। ওঁর মনের অন্ধিসন্ধিগুলো সুনীলের প্রতি তীব্র ঘৃণায় ভ ওঠে। কিন্তু এখন তিনি কী করবেন, পূরবীকে কী বলবেন, কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

পূরবী কখন উঠে গিয়েছিল। সে ফিরে আসে।

—স্যার, আজ রাত্রে আমাদের এখানেই যা হোক খেয়ে যান।

—আজ নয়রে মা, বরং আর একদিন আসব। আমি এখন উঠি। রাত কে হল।

—নিশ্চয় আবার আসবেন। পূরবী নিচু হয়ে প্রণাম করে।

দত্ত সাহেব পরম স্নেহে ওর মাথায় হাত রাখেন। —ভাল থাকিস মা, শক্ত থাকিস সাহস হারাস না কখনও। জানবি একদিন না একদিন জানোয়ারগুলো শাস্তি পাবে পাবেই। কেউ রেহাই পাবে না।

দরজার বাইরে দত্ত সাহেব পা বাড়ান। নির্জলা চোখে পূরবী তাকিয়ে থাকে

বিরিঞ্চিনাথের বিচার

অনামা লেখক বিরিঞ্চিনাথ হাওলাদারের আজ বিচার। তার বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ। অভিযোগ এনেছে একজন-দুজন নয়, সাত সাত জন। অবশ্য সবাই একসঙ্গে নয়। কেউ কেউ আলাদা ভাবে, কেউ কেউ আবার একসঙ্গে। মোট তিন খানা মানহানির আবেদন জমা পড়েছে যদিও প্রত্যেকটির মূল বক্তব্য মোটামুটি একই। কোনও মতেই লেখক বলে বিবেচিত হতে পারে না এমন একটা ফালতু লোক বিরিঞ্চিনাথ নাকি একটি গল্প লিখেছে। শুধু গল্প লিখলে কেউ মাথা ঘামাত না। এমন কত লোকই তো লেখে। কিন্তু বিরিঞ্চিনাথের গল্প কী করে যেন একটি নামী পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সাহিত্য-বিচারে আদতে কোনও পদেরই নয় এমন একটি গল্পে অভিযোগকারীদের চরিত্রে একত্রে এবং পৃথকভাবে কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে। আবেদনকারীদের এতেও তেমন মারাত্মক ক্ষতি হয়তো হতনা, কারণ গল্প-টল্প নিয়ে এরা কেউই মাথা ঘামায় না। কিন্তু কিছু সমাজ বিরোধী দুষ্কৃতী সেই গল্প পুনর্মুদ্রণ করে অভিযোগকারীদের প্রত্যেকের স্ত্রীর কাছে পৃথক ভাবে পাঠিয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই মর্যাদাহানিকর মিথ্যা গল্পের কপি স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষদের অনেকের কাছেই এবং সেই সঙ্গে সরকার ও আদালতের কাছেও পাঠিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও এই দুষ্কৃতীদের প্রকৃত পরিচয় জানা যায়নি। তাই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহামান্য আদালত এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের শরণ নিতে অভিযোগকারীরা এই মুহূর্তেই পারছে না। কিন্তু যেহেতু তথাকথিত লেখক-গল্পকার বিরিঞ্চিনাথ হাওলাদারের লেখা গল্পটিই আবেদনকারীদের মর্যাদা হানি এবং অবমাননার জন্য আদতে দায়ী, সেহেতু বিরিঞ্চিনাথ হাওলাদারকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে এবং তার কাছ থেকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ আদায় দিয়ে অভিযোগকারীদের হৃত সম্মানের খানিকটা ফিরিয়ে দেবার জন্য মহামান্য আদালতের কাছে সাতজন বিচারপ্রার্থী আবেদন জানিয়েছে।

প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্ত লেখকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই চার্জ গঠন করা হয়ে গিয়েছে। অভিযুক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক অবশ্য প্রাথমিক শুনানি পর্বেই অব্যাহতি পেয়ে গিয়েছেন। সম্পাদক ও প্রকাশক যে অব্যাহতি পাবেন এটা জানাই ছিল। কারণ তাঁদের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শ্যামল মুখার্জী। আইনের সূক্ষ্ম ও জটিল যুক্তিজাল বিস্তার করে এবং বিভিন্ন হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের নানা রুলিং এর উল্লেখ করে তিনি নিবেদন করলেন যে অভিযুক্ত সম্পাদক ও প্রকাশক আদৌ মানহানির কোনও ব্যাপারে যুক্ত নন। তাঁদের পত্রিকাটি একটি পরিচিত সাহিত্য পত্রিকা। দুনীর্তির স্বরূপ উন্মোচন করতে লেখা একটি সাহসী ও সুন্দর গল্প সরল বিশ্বাসে প্রকাশ করে অভিযুক্ত প্রকাশক ও সম্পাদক কোনও অন্যায় করেননি এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বা জ্ঞাতসারে কাউকে অসম্মান করেন নি। যদি গল্পের লেখক কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মানহানির উদ্দেশ্যে এ গল্প প্রকাশক-সম্পাদকের অজ্ঞাতসারে লিখে থাকেন, তবে তার দায়দায়িত্ব লেখকের

নিজস্ব।

ব্যারিস্টার মুখার্জীর সওয়ালের বিরোধিতা উপস্থিত কোনও আইনজীবী বা অভিযোগকারী করেননি। সহজেই তাই সম্পাদক ও প্রকাশক অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যান।

লেখক হিসাবে বিরিঞ্চিনাথ হাওলাদারের আদপেই কোনও পরিচিতি নেই। তার নামও তার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের বাইরে বিশেষ কেউ জানেনা। কাজেই তার বিরুদ্ধে আনা মামলার শুনানীতে কারও কোনও আগ্রহ থাকার কথা নয়। তবু কিছু কৌতূহলী লোক মানহানির মামলার মূল বিচার পর্বে উপস্থিত আছে। কেচ্ছা শোনার এমন সুযোগ বেশি পাওয়া যায় না।

যথা সময়ে তিনটি মামলার ডাক পড়ে প্রায় একই সঙ্গে। আদালতের পেয়াদা হাঁকল অভিযুক্ত বিরিঞ্চিনাথ হাওলাদার হাজির। বিরিঞ্চিনাথ হাজিরই ছিল। সে সাড়া দিতে পেয়াদা তাকে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল।

প্রথম মামলায় অভিযোগকারী দুজন। উচ্চ ন্যায়ালয়ের অ্যাডভোকেট পতিত পাবন পতিতুন্ডি এবং ঐ ন্যায়ালয়ে কর্মরত একজন কোর্ট অফিসার মহম্মদ জালান। এঁদের অভিযোগ অভিযুক্ত বিরিঞ্চিনাথ ব্যোমকেশ নকলনবিস নামের জনৈক শিক্ষকের দুর্গতি নিয়ে যে এঁদো গল্প ফেঁদেছে, তাতে নাম করে অভিযোগকারীদের চরিত্র হনন করা হয়েছে। অ্যাডভোকেট মশাই নাকি হাইকোর্টে ব্যোমকেশ নকলনবিসের মামলার দায়িত্বে ছিলেন এবং মামলা চলাকালে তিনি ব্যোমকেশ নকলনবিসকে অন্যায় ভাবে ঠকিয়ে তার পিতৃদত্ত জমির সিংহভাগ, স্ত্রীর কিছু গহনা এবং বকেয়া পাওনার অধিকাংশই আত্মসাৎ করেছেন। মহম্মদ জালানের অভিযোগ, বিরিঞ্চিনাথ তার গল্পে দেখিয়েছে অভিযোক্তা নাকি মহামান্য হাইকোর্টে ব্যোমকেশ নকলনবিসের মামলা চলা কালে চা-পান-তামাক ইত্যাদির নামে ব্যোমকেশ বাবুর কাছ থেকে নানাসময় প্রচুর অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। এই ভাবে অভিযুক্ত বিরিঞ্চিনাথ ইচ্ছাকৃত ভাবে একজন সজ্জন, কর্তব্য পরায়ণ, সৎ সরকারী কর্মচারীকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে দেখিয়ে তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছে।

পতিতপাবন পেশায় আইনজীবী। কাজেই নিজের এবং মহম্মদ জালানের পক্ষে সওয়াল করার দায়িত্ব তিনি নিজেই নেন। গল্পের জেরক্স কপিতে মর্যাদা হানিকর অংশগুলি চিহ্নিত ছিল। চিহ্নিত কপিটি বিচারকের কাছে পৌঁছে দিয়ে পতিত পাবন তাঁর বক্তব্যের শেষ অংশে আসেন।

—ইয়োর অনার, লেখাটি আপনি দয়া করে দেখুন। আপত্তিকর অংশগুলির নীচে দাগ দেওয়া আছে। চোখ বোলালেই দেখতে পাবেন আবেদনকারীদের চরিত্র অত্যন্ত অসম্মানের সঙ্গে আঁকা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি অভিযুক্তকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।

বিচারক মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। পতিতপাবন শুরু করেন।

বিরিঞ্চিনাথবাবু, আপনি নাকি একজন বিখ্যাত লেখক। তা এ পর্যন্ত কটি লেখা লিখেছেন?

বিরিঞ্চিনাথ ঘর শুদ্ধ সবাইকে একবার দেখে নেয়। তারপর উত্তর দেয়, বলা শক্ত।

পতিতপাবন ব্যঙ্গ করে ওঠেন। —আপনি এত বেশি লিখেছেন যে সংখ্যাটি মনে রাখাই আপনার পক্ষে দুষ্কর! রবি ঠাকুরের চেয়েও বেশি নাকি?

—আজ্ঞে না। এত কম লিখেছি যে সংখ্যাটি মনে রাখাই কঠিন।

—কতদিন ধরে আপনি লিখছেন?

—অল্প বয়স থেকেই বলতে পারেন।

—এখন আপনার বয়স কত?

—পঞ্চান্ন-ছাপান্ন হবে।

—এতকাল ধরে তবে তো আপনি অনেক গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ লিখে ফেলেছেন!

—লিখতে পারলে খুবই খুশি হতাম। কিন্তু লিখতে পারিনি।

—কেন? বছরে আপনি কটা গল্প লেখেন?

—কোনও হিসেব নেই।

পতিতপাবন এবার ধমক দেন। —আদালতে সত্যি কথা কবুল করতে আপনি বাধ্য। মিথ্যা কথা বললে শাস্তি পেতে হবে, তা জানেন?

—সত্যি কথাই বলেছি আমি।

—তাই নাকি! বেশ এক বছরে সব থেকে বেশি কটা গল্প লিখেছেন এ পর্যন্ত এবং বছরে সব থেকে কমই বা কটি?

—সব থেকে বেশি হলে পাঁচ-ছটা, আর সব থেকে কম হলে একটাও না।

পতিতপাবন বিচারকের উদ্দেশ্যে বলেন, ইয়োর অনার, রেকর্ড করুন।

এবার বিরিঞ্চিনাথকে বলেন, আপনি নিজেকে কি একজন লেখক বলে ভাবেন?

—হ্যাঁ এবং না।

—সে আবার কী? আপনি কি আদালতটাকে রসিকতা করার জায়গা ভেবেছেন?

—আদৌ না। তা ভাবলে আমি সত্যি কথা বলতাম না।

—এটা সত্যি কথার নমুনা? হ্যাঁ এবং না?

অভিযুক্তের কাঠগড়ায় উঠে প্রথমটায় বিরিঞ্চিনাথের পা দুটো ঠকঠক করে অনেকক্ষণ কেঁপেছিল। বুকের মধ্যেও হাতুড়ির ঘা পড়ছিল খুব। সেই সময় সে কেবলই ভাবছিল ধারদেনা করে একজন আইনজীবী নিয়োগ করলেই ভালো হত। হয়তো তাহলে তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠনও হতনা। কিন্তু প্রতিদিন তার ওপর এত দেনা শোধের চাপ থাকে যে সে আর নতুন করে ধারের পথে যেতে চায়নি। জেরা শুরু হবার পর হাঁটুর কাঁপুনি আর হৃৎপিন্ডের লাফানি দুটোই অনেক কমে গেছে। অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে বিরিঞ্চিনাথ এখন। সে কারণেই খানিকটা সাহসের সঙ্গেই পতিতপাবনের তির্যক মন্তব্যের জবাব দেয় সে, আমি সত্যি কথাই বলেছি।

—সত্যি কথা কী ভাবে বলেছেন পরিষ্কার করে বলুন। জজ সাহেব এবার আদেশ দেন।

পতিতপাবনের মতো বিরিঞ্চিনাথও জজকে উদ্দেশ্য করে বলে, ইয়োর অনার,

যে লেখে এক অর্থে সেই লেখক। এই অর্থেই আমি হ্যাঁ বলেছি। তাছাড়া অল্প হলেও গল্প-টল্প আমি মাঝে মধ্যে কিছু লিখেছি। সেটাও হ্যাঁ বলার একটা কারণ কিন্তু প্রচলিত অর্থে সাধারণ মানুষ লেখক বলতে খ্যাতনামা কোনও সাহিত্যিককে বোঝেন। মানে যাঁদের পরিচিতি আছে এবং যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাঁদেরই বোঝেন। সাহিত্যিক বলতে এই সব নামী লেখকদের যা বোঝায়, আমি তা নই সেই অর্থে লেখক বলে আমি নিজের পরিচয় দিতে পারি না। আমার উত্তর এই বিচারেই না।

জজ মাথা নাড়েন। আদেশ দেন, প্রসিড।

পতিতপাবন উঠে দাঁড়ান। এবার মোক্ষম প্রশ্ন করেন, আপনি আমাকে চেনেন?

—না।

—আগে কখনও দেখেছেন?

—না। সে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয়নি।

—আমার সম্বন্ধে কিছু জানেন?

—তা জানতে যাব কেন? শুধু বুঝেছি, আপনি একজন আইনজীবী।

—এই মামলার অন্যতম বাদী মহম্মদ জালানকে চেনেন?

—না, তবে এঁর নাম আমি শুনেছি।

—বটে! কোথায় শুনেছেন?

—কেউ একজন এঁর নাম আমায় বলেছেন।

—ইনি কোথায় কাজ করেন জানেন?

—সঠিক জানিনা। তবে আমার গল্পে ইনি হাইকোর্টের একজন কর্মচারী।

—আপনি হাইকোর্টে গেছেন কখনও?

—আজ্ঞে না। বিশাল বাড়িটাকে বাইরে থেকেই যা দেখেছি। বাড়িটা দেখবার মতনই বটে।

—থামুন। বাজে কথা বলে আদালতের সময় নষ্ট করবেন না। হাইকোর্টের কোনও কর্মচারীকে আপনি চেনেন?

—না।

—ওখানকার কোনও আইনজীবীকে চেনেন?

—আজ্ঞে না।

—দ্যাট্‌স অল্ ইয়োর অনার। পতিতপাবন তাঁর জেরা শেষ করেন।

এবার দ্বিতীয় মামলার ডাক হয়। এই মামলায় বাদী দুজন। প্রথমজন ব্রজেন দত্ত, সেক্রেটারি, ভালুকডি-কেন্দাপাড়া ফটিক চাঁদ মেমোরিয়াল জুনিয়র হাইস্কুল। দ্বিতীয় জন গণেশ খাটুয়া, ঐ স্কুলের করণিক।

ব্রজেন দত্তের অভিযোগ, বিরিঞ্চিনাথ হাওলাদার তার গল্পে অভিযোক্তার চরিত্র এমনভাবে এঁকেছে যা পড়ে যে কোনও লোকের মনে হবে তিনি স্কুলের সেক্রেটারি হয়ে নানা ভাবে স্কুলের টাকা আত্মসাৎ করছেন। নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর দুর্নীতিও এই গল্পে প্রকট। অভিযুক্ত লিখেছে, ব্যোমকেশ নকলনবিস নামে জনৈক শিক্ষকের সাময়িক নিয়োগের সময়ও অভিযোগকারী টাকা নিয়েছেন। নাম মাত্র

অর্থের বিনিময়ে তাকে দিয়ে কয়েক বছর কাজ করিয়েছেন এবং স্কুল ফান্ড থেকে তাকে দেওয়া এই সামান্য পারিশ্রমিকের টাকাতেও নিয়মিত ভাগ বসিয়ে গেছেন। এমনকী শিক্ষক নকলনবিসবাবু মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে এবং ডি. আই. অফিসের আদেশক্রমে স্থায়ীভাবে কাজে যোগ দিতে এলেও ব্রজেন দত্ত তার কাছ থেকে প্রচুর অর্থ অন্যায় ভাবে দাবি করেছেন এবং পরে তা মোচড় দিয়ে আদায় করেছেন। মিথ্যা এইসব কাহিনী ব্রজেন দত্তের মতো মানী ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদায় ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। বাদীর আরও অভিযোগ স্কুলের সঙ্গে যুক্ত থাকা ছাড়াও তিনি নির্বাচিত গ্রাম প্রধান। তাই উর্ধ্বতন সরকারি আমলাদের কাছে ও গ্রাম সংসদের সভায় বিরিঞ্চিনাথের এই গল্পের জন্য বাদিকে নানা অবাঞ্ছিত সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। এই সব অযৌক্তিক সমালোচনাতে বাদি ব্রজেন দত্তের সম্মানে মস্তবড় আঘাত লেগেছে এই অসম্মান ভোগের জন্য প্রধানত দায়ী—এই বিরিঞ্চিনাথ নামের এই উচ্চিংড়ে লেখকটি।

গণেশ খাটুয়ার অভিযোগ, প্রতিবাদী তার গল্পে দেখিয়েছে অভিযোগকারী শিক্ষক ব্যোমকেশ নকলনবিসের এরিয়ার বিল তৈরি না করে দীর্ঘদিন ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে রেখেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর এক মাসের পুরো মাইনের টাকা পাওয়ার শর্তে বিল তৈরি করে ডি. আই. অফিসে পাঠিয়েছেন।

ব্রজেন দত্ত ও গণেশ খাটুয়ার পক্ষের উকিলবাবু উঠে দাঁড়িয়ে আদালতের উদ্দেশ্যে বলেন, ইয়োর অনার, পতিতপাবন বাবু তাঁর মামলায় যা যা জিজ্ঞাসা করেছেন তা আর আমি নতুন করে অভিযুক্তের কাছ থেকে জানতে চাইছিনা। সেগুলো সব অ্যাডমিটেড। আমি অভিযুক্তকে অন্য দু চার কথা জিজ্ঞাসা করার অনুমতি চাইছি।

—প্রসিড। জজ সাহেব অনুমতি দেন।

—বিরিঞ্চিনাথ বাবু, আপনি আমাদের এই মামলার অভিযোগকারীদের চেনেন?

—আজ্ঞে না।

—তাদের সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার বাইরে আর কিছু জানেন?

-—না।

—যা লিখেছেন তা কি আপনার প্রত্যক্ষ জ্ঞানে লেখা? এ সম্বন্ধে তথ্যাদি আপনার কাছে আছে কিছু?

—আজ্ঞে না। আমি শোনা কথায় লিখেছি।

—ইয়োর অনার, রেকর্ড করুন অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগকারীদের চেনে না এবং তাদের সম্বন্ধে যা লিখেছে তা সবই শোনা কথা। এ ব্যাপারে অভিযুক্তের কাছে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণও নেই।

এবার বিরিঞ্চিনাথকে জিজ্ঞাসা। হ্যাঁ বিরিঞ্চিবাবু, আপনি ভালুকডি-কেন্দাপাড়া ফটিকচাঁদ মেমোরিয়াল জুনিয়র হাইস্কুলে কখনও গেছেন?

—না।

—ওই স্কুল সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছু জানেন?

—আজ্ঞে না।

—দ্যাট্‌স অল, ইয়োর অনার।

উকিলবাবু জেরা শেষ করেন।

তৃতীয় মামলার ডাক পড়ে এবার। অভিযোগকারী এক্ষেত্রে তিনজন। তারানাথ বটব্যাল. প্রথম আবেদনকারী। তিনি ডি. আই. অফিসের একজন সহকারী পরিদর্শক। জেলা পরিদর্শকের পক্ষে নানা আদালতে মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা ও সে সবের তদারকি করা তাঁর কাজ। দ্বিতীয় বাদী মনোহর দাস, একই অফিসের নিম্নবর্গীয় করণিক। তৃতীয় অভিযোগকারী মথুরা মাহাতো, ডি. আই অফিসেরই পিয়ন। অভিযোগকারীদের পক্ষে এলাকার সব থেকে ঝানু অ্যাডভোকেট প্রহ্লাদ বেরা উঠে দাঁড়ান।

—বিরিঞ্চিনাথবাবু, আমি প্রথমেই আপনার সাহসের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি সরকারী অফিসের দুর্নীতির মুখোশ খুলে দিতে আপনি যে গল্প লিখেছেন তা নিঃসংশয়ে প্রশংসার দাবি রাখে।

কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বিরিঞ্চিনাথ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়। এই উকিল ভদ্রলোক এসব ভালো ভালো কথা বলছেন কেন! এঁর মৎলবটা কী!

—বিরিঞ্চিনাথবাবু, আপনি একজন মহৎ লেখক। আপনার বাস্তব ভিত্তিক গল্পটি বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগদর্শন করবে। কিন্তু লেখক মশাই, আপনার গল্পে বর্ণিত বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে আপনার প্রত্যক্ষ যোগ কতটুকু?

বিরিঞ্চিনাথ দ্বিধা করে। কী বলা উচিত ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। প্রহ্লাদ বেরা সবিনয়ে তাড়া দেন, বলুন, বিরিঞ্চিবাবু, আদালতের কাছে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করুন

—দেখুন, সত্যিকথা বলতে কী, আমার টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতাই এ গল্পের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে।

—তার মানে অভিযোগকারীদের তিন জনকেই আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন?

—ঠিক তা নয়, ব্যক্তিগত ভাবে আমি এঁদের কাউকেই চিনিনা! আগে কখনও এঁদের দেখিনিও। তাই এদের কাজকর্ম সম্বন্ধেও আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। তবে—

—তবে কী বলুন।

—তবে এ ধরনের চরিত্র অন্য নামে ও অন্য ভাবে, মানে যে ভাবে আমার গল্পে বলতে চেয়েছি সে ভাবে, আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

—কোথায় প্রত্যক্ষ করেছেন? যতদূর জানি আপনি ভূষিমালের কারবারী শেঠ পূরণচাঁদ আগরওয়াল অ্যান্ড সন্সের একজন অতি ঘাঘু কর্মচারী।

—ঠিকই বলেছেন। ঘাঘু কিনা জানিনা, তবে পূরণচাঁদে আমি দীর্ঘদিন কাজ করছি।

—সেখানেই সরকারী অফিসের চরিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই?

আদালতে মৃদু হাসির শব্দ ওঠে। বিরিঞ্চিনাথের কান দুটো হঠাৎ ঝাঁ ঝাঁ ক ওঠে। মাথাটার মধ্যেও গরম বোধ হচ্ছে। কিন্তু সে নিজেকে সংযত করে। উ দেয় ধীরে ধীরে।

—আমার এক বন্ধু আছেন রাজ্য সরকারে। পদস্থ অফিসার। বিদ্যালয় বিভাগের একটি বড় পদে তিনি কিছুদিন আগেও কাজ করতেন। তাঁর কাছে,

অফিসে আমি মাঝে মাঝেই যেতাম। সেখানেই দেখেছি এমন কিছু চরিত্র, শুনেছি আমার গল্পে বলা ঘটনার মতো নানা ঘটনাও।

—কিন্তু আপনি অভিযোগকারীদের নাম করে তাঁদের সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তেমন কিছু করতে এঁদের কাউকে আদৌ দেখেননি?

—এঁদের তো আমি চিনিই না। কাজেই এঁদের ব্যাপরে কিছু দেখার প্রশ্নও ওঠে না।

—তবে এঁদের নাম করে আপনি অসত্য, অপমানজনক ও মানহানিকর এমন গল্প লিখলেন কেন? আপনার আসল উদ্দেশ্য কি ছিল?

—দেখুন এঁদের নাম গুলো হয়তো ভুল বোঝাবুঝির ফলে এসে গেছে। কিন্তু ঘটনা যা লিখেছি সবই মোটামুটি সত্যি। কারণ আমার গল্পের নায়ক শিক্ষক ব্যোমকেশ নকলনবিস নিজেই আমাকে তাঁর দুঃখের পাঁচালি শুনিয়েছেন।

—আপনি বলতে চান যে, ব্যোমকেশ নকলনবিস মশাই অভিযোগকারীদের নাম করে করে বলেছেন?

—নাম গুলো সবই তাঁর বলা। বলার সময় তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে নামগুলো আসল নয়, তিনি নাম-পরিচয় গোপন করে বলছেন। আমি ওঁর কথা বিশ্বাস করেছি।

—আপনি ব্যোমকেশবাবুর বলা নামগুলোই হুবহু রেখে দিলেন? পাল্টালেন না? এদিকে গল্প লেখেন?

—নাম পাল্টাবার দরকার তো কিছু ছিল না যেহেতু উনি নিজেই তো নাম পাল্টে দিয়েছেন। অন্তত আমাকে তাই বলেছিলেন।

—এখনও সে কথা আপনি বিশ্বাস করেন?

—না। বুঝতে পারছি উনি সঠিক নাম গুলোই ব্যবহার করেছেন এবং আমাকে সত্যি কথাটা বলেননি।

এই সময় জেরা থামিয়ে প্রহ্লাদ বেরা আদালতকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ইয়োর অনার, আমি সাক্ষী ব্যোমকেশ নকলনবিসকে জেরা করতে চাই।

আদালতের পেয়াদা হাঁকে, সাক্ষী ব্যোমকেশ নকলনবিস হাজির।

কিছুক্ষণ পরেই ভালুকডি-কেন্দাপাড়া ফটিক চাঁদ মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষক ব্যোমকেশ নকলনবিস সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ান। সাক্ষীকে শপথ বলানো শেষ হলে প্রহ্লাদ বেরা তাঁকে জেরা করতে শুরু করেন।

—ব্যোমকেশবাবু, আপনি একজন শিক্ষক, ভালুকডি-কেন্দাপাড়া স্কুলে কাজ করেন?

—আইজ্ঞা।

—শিক্ষক হিসাবে সমাজে আপনার যেমন মর্যাদা আছে, তেমন দায়িত্ব যথেষ্ট আছে তো?

—আইজ্ঞা।

—ছাত্রদের নিশ্চয়ই আপনি সৎ হতে শিক্ষা দেন?

—হঁ, নিশ্চয় দিই। কেনে দিব না?

—ঠিক আছে। ছাত্রদের আপনি সত্যিকথা বলতেও নিশ্চয়ই বলেন?

—ইটাতো ঠিকই বটে।

—আপনি নিজেও সত্যি কথা বলেন?

—হঁ আইজ্ঞা। খুব ঠেকায় না পইড়লে ফালতু মিছা বইলতে যাব কেনে?

—আপনি অভিযুক্ত বিরিঞ্চিনাথবাবুকে চেনেন?

ব্যোমকেশ অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বিরিঞ্চিনাথকে দেখেন। দুজনের চোখে চোখ পড়ে।

—ন আইজ্ঞা, ইয়াকে তো চিন্‌হি নাই।

—এঁকে আগে কখনও দেখেছেন?

—ন আইজ্ঞা।

—এঁর সঙ্গে কখনও কোনও কথাবার্তা বলেন নি?

—ন আইজ্ঞা। চিনা জানা থাইকলে ত কথাআ বইলবঅ।

—ইয়োর অনার, সাক্ষীর কথা রেকর্ড করুন। তিনি অভিযুক্তকে কোনওদিন চেনেন না।

বিচারকের ডিটেকশন শেষ হলে প্রহ্লাদ বেরা ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করেন, এই মামলার অভিযোগকারী অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর তারানাথবাবুকে আপনি চেনেন?

—হঁ সার।

—তিনি তাঁর অফিসের মামলা মোকদ্দমা দেখা শোনা করেন?

—হঁ আইজ্ঞা।

—আপনি আপনার চাকরির ব্যাপারে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে যে মামলা করেছিলেন, সে মামলা দেখাশোনা কে করেছিলেন?

—আইজ্ঞা তারানাথবাবুই দেখ্‌ভাল কইরতেন।

—এজন্য তাঁকে কলকাতায় যেতে আসতে হত?

—হঁ সার।

—অনেক সময় আপনারা একসঙ্গেও যাতায়াত করতেন?

—হঁ সার।

—তখন কী আপনি ওঁর যাতায়াতের খরচ দিতেন? নাকি কলকাতায় ওঁর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন?

মা কালীর স্টাইলে জিভ বার করেন ব্যোমকেশ নকলনবিস। —কী বলেন সার, ইটা কখনও সম্ভব? ইনসপেকটর বাবুর খরচাপাতি আমি দিব কেনে? উনি তো হামদের সংগে কোর্টে লড়ালড়ি কইরছেন। আর হামি দিলেই সার লিবে কেনে?

—ইয়োর অনার, সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করুন।

—হ্যাঁ ব্যোমকেশবাবু, মনোহরবাবুকে আপনি চেনেন?

—চিন্‌হি বটে।

—কী করে চিনলেন?

—ডি. আই আপিসে উয়াকে দেখ্যেছি। হামদের এরিয়ারের বিল্‌টো উয়ার হাতেই শেষতক পাশ হল্য।

—এ জন্য উনি আপনার কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়েছেন বা কোনও টাকা

পয়সা চেয়েছিলেন?

আবার জিভ বার করেন ব্যোমকেশ। —ইটা কখনও হতেএ পারে সার? উয়ার মতন ভালঅ লক গরিব মাস্টরের থিক্যা ট্যাকা মাঙবে কী! আন্‌খাই উল্টা পুল্টা শুধাছেন!

—আপনি সত্যি কথা বলছেন না, ব্যোমকেশবাবু।

—মা কালীর কিরা্যা।

—ইয়োর অনার রেকর্ড করুন। প্রহ্লাদ বেরা এবার মথুরাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করেন, ব্যোমকেশবাবু, আপনি একে চেনেন?

—হঁ সার।

—কী করে চিনলেন?

—ডি. আই. আপিসে চা আন্যে দিলে। মিঠাই দিলে। টোস্ট-ডিম দিলে। কতঅ ভালঅ বটে।

—সে সবের দাম দিল কে? খেলই বা কে?

—ইটা কী পুছেন সার! হামি খাবঅ, পয়সা দিবে অন্যঅ লক?

—আপনি ওকে পয়সা কড়ি কখনও দেননি?

—ন আইজ্ঞা।

—ও আপনার কাছে কখনও পয়সা কড়ি চেয়েছে?

—ন আইজ্ঞা। চায়ের দাম পজ্জন্ত এক-দু দিন লিলে না।

—ইয়োর অনার, রেকর্ড করুন।

ব্যোমকেশের দিকে তাকিয়ে প্রহ্লাদ আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন।

—অভিযুক্ত বিরিঞ্চিনাথ বাবুর গল্পটা আপনি পড়েছেন?

—হঁ সার। পইড়তেই হলঅ।

—কেন?

—মকদ্দমাটার জন্য।

—উনি যা সব লিখেছেন, সে সব কি সত্যি?

—কি যে বলেন সার! মিছা, মিছা, পুরাই মিছা।

—দ্যাট্‌স অল, ইয়োর অনার।

প্রহ্লাদ বেরা আসন গ্রহণ করেন। বিচারক বিরিঞ্চিনাথকে জিজ্ঞাসা করেন, সাক্ষীকে আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান?

—হ্যাঁ, স্যার।

—বেশ করুন। বিচারক অনুমতি দেন।

বিরিঞ্চিনাথ একটু ভাবে। কী প্রশ্ন ব্যোমকেশকে করা যায়। বোঝাই যাচ্ছে সে পাল্টি খেয়ে গেছে। আর তাই পুরো উল্টো কথা বলে গেল। এটা ওটা ঠিক করে রিঞ্চনাথ জেরা শুরু করে। —ব্যোমকেশবাবু, আমি যে গল্পটা লিখেছি সেটাতো আপনি পড়েছেন বললেন।

—হঁ পড়্যেছি।

—এ গল্পের সঙ্গে আপনার নিজের জীবনের অনেকখানি মিল আছে না?

আচমকা এ প্রশ্নে ব্যোমকেশ চুপ করে থাকে। জজ সাহেব তাকে ধমক দেন

—বলুন, উনি যা জিজ্ঞাসা করছেন তার ঠিক ঠিক জবাব দিন।

—অনেকটাই মিল আছে বটে।

—এ গল্পই আপনি আমাকে বলেছিলেন না? ব্যোমকেশ সত্যি-মিথ্যার দোলাচলে একটু সময় ঘুরপাক খায়। তারপর বলে, ন আইজ্ঞা, হামি কাউকে কিছু বলি নাই

—সেই যে দুজনে একসঙ্গে পুরুলিয়া এক্সপ্রেসে ফিরছিলাম। আমরা পাশাপাশি বসে নানা আলাপ করছিলাম। এক সময় কথায় কথায় আপনি গল্পটা বললেন

—মিছা বটে। হামি কিছু বলি নাই। হামি কিছু জানি নাই।

– মনে করে দেখুন ব্যোমকেশবাবু, এই সময় আপনার খুব টানাটানি চলছিল অনেক দিন ঠিক খাওয়া জুটত না বলেছিলেন। ভাল করে ভেবে বলুন। বলেছিলেন আপনার স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদেরও দুবেলা ঠিক মতো খাবারের জোগাড় করতে পারছেন না।

ব্যোমকেশ কী বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওর চোখ যায় ব্রজেন দত্ত আর তারানাথ বটব্যালের দিকে। ওদের দুজনেরই চোখগুলো যেন জ্বলছে।

—আপনি মিছাই বলছেন। হামরা রোজঅই খাঁয়েছি। ভাল ভাল খাঁয়েছি। মাছ-কুঁকড়া-মিঠাই-লাড্ডু—

ব্যোমকেশ আর কথা বলতে পারে না। ওর গলাটাকে কে যেন জোর করে চেপে ধরে। সাক্ষীর কাঠগড়াতেই সে বসে পড়ে।

জজ সাহেব এবার ব্যোমকেশকে ধমক দেন। —আপনি শপথ নিয়ে সাক্ষ দিচ্ছেন। ঠিক করে বলুন সব।

—হামি তো ঠিকঅই বল্যেছি, সার।

জজ সাহেব রেগে গিয়ে এবার নিজেই জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেন।

—আপনার বাবা আপনাকে জমি দিয়েছেন কিছু?

—হঁ সার।

—কত জমি দিয়েছেন?

—পাঁচ বিঘার মতন হবেক।

—তার এখন কতটা আছে?

—এখন মোটেই নাই সার।

—ক মাসের এরিয়ারের টাকা পেয়েছেন?

—একুশ মাসের এরিয়ার সার।

—কত টাকা মোট?

—ছত্রিশ হাজার ছয়শত সার।

—হাতে পেয়েছেন কত?

ব্যোমকেশ নকলনবিস এদিকে ওদিকে তাকায়। ব্রজেন দত্ত আঙুল তুলে কী দেখাতে থাকেন।

—বলুন, কত পেয়েছেন?

সতীশ নিজের হাত দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে উল্টে দেয়। —ন

আইজ্ঞা। শেষতক কলসভর গঙ্গাজল পালি।

—বাকি টাকা কী হল?

—ভূতে খাঁয়েছে সার।

শুনানীর এখানেই শেষ। জজ সাহেব দিন দেন। তিনটি মামলার রায় এক সঙ্গেই দেবেন তিনি।

কাঠগড়া থেকে নেমে আসে অভিযুক্ত লেখক বিরিঞ্চিনাথ। নামে ব্যোমকেশও। বিরিঞ্চিনাথকে দেখে সে একগাল হাসে। বিরিঞ্চিনাথ মুখ ঘুরিয়ে নিতে চায়। ঘৃণা হয় মিথ্যাবাদী ক্লীব লোকটাকে দেখে। এ নাকি আবার শিক্ষক! ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরির দায়িত্ব এদের হাতে!

নির্দিষ্ট তারিখেই বিচারক রায় দেন। তিনটি মোকদ্দমার সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে তিনি অভিযুক্ত লেখক বিরিঞ্চিনাথকে মানহানির অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন এই মামলার সাত অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে পূর্ণ তদন্ত করে আদালতের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে।

রায় শোনার পর উজ্জ্বল মুখে বিরিঞ্চিনাথ কাঠগড়া থেকে নেমে আসে। ব্যোমকেশ নকলনবিসও এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। বিরিঞ্চিনাথ চলে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে।

—কী ব্যোমকেশবাবু, আপনি তো আমায় চেনেন না। এত মিথ্যা কথা বললেন কী করে? বিবেকে বাধল না?

ব্যোমকেশ লজ্জা পায়। কিছু মনে কইরবেন না আইজ্ঞা। এমনটা বলতেই তো উয়ারা বল্যেছিল। ব্যোমকেশ তার দুটি হাত জোড় করে।

—কারা বলেছিল?

—সিক্রেটারি বাবু, ইনিসপেকটার বাবু আর মনোহরবাবু।

—ওরা বলেছিল বলেই আপনি শপথ নিয়ে মিথ্যে কথা বলবেন?

—আপনি কুছু দুখ্ রাইখবেন না, লেখক সার। উয়াদের পাছেই তো উঠা বসা, তাই উয়াদের আক্‌কোশের হাত থিক্যা বউ ছেল্যা নিয়া বাঁইচতে টুকু মিছা বল্যেছি। কিন্তুক আপনার লিখাটা খাঁটি বটে। জজ সায়েবও সিটা মানেএ নিলঅ। এমনি আরও ল্যাখেন সার। ডর না পাঁয়ে সাচ কথা লেখ্যে যান। এটু লড়ন চড়ন দরকার।

বিরিঞ্চিনাথ প্রসন্ন দৃষ্টিতে ব্যোমকেশ নকলনবিসকে দেখে। তার দৃষ্টি ব্যোমকেশকে ছাড়িয়ে, আদালত ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যায়। ব্যোমকেশ ঠিক বলেছে। সে লিখবে, আরও লিখবে। সমাজ শাসনে দুর্নীতির মুখোশ খুলতে অনেক অনেক লিখবে। সে নিশ্চিত শেষ বিচারে তারই জয় হবে।

অন্ধকার ভেঙ্গে

মেডিক্যাল কলেজের মেন গেটে দাঁড়িয়ে ইতিউতি চাইতে থাকে অনঙ্গ। ওর পকেটে এক গোছা কাগজ, হাসপাতাল থেকে দিয়েছে। এর মধ্যে একটা ডিসচার্জ সার্টিফিকেটও আছে। আছে ওর রক্ত এবং অন্যান্য পরীক্ষার রিপোর্ট। ওর রক্তে কোনও দোষ ধরা পড়েনি। ধরা পড়েছে বুকের দোষ-পালমোনারি কক্‌স ডিজিজ না কী যেন নাম বলেছে ওরা। এ সব না বলে টিবি বললেই পারত ডাক্তারবাবুরা। সে যাই দোষ বুকে পাওয়া যাক, অনঙ্গ আর ভাবে না। রক্তের মারণ দোষ পাওয়া গেলেই যত অশান্তি হত।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও জনস্রোতে একটিও চেনা মুখ পায় না অনঙ্গ। মদন, ওর ছোট ভাই, আসবে বলেছিল। ওকে বাড়ি নিয়ে যাবে। মাঝেমাঝে ও হাসপাতালে আসত। দাদার খোঁজ নিত। তবে দেখা করত না। দেখা করল এই সেদিন। সে সব থাক, তখন অনঙ্গর সব পরীক্ষা হয়ে গেছে। কক্‌স ছাড়া অন্য দোষ পাওয়া যায়নি। কিন্তু মদন এখনও এল না কেন!

একটানা দাঁড়িয়ে থেকে অনঙ্গর পা দুটো ব্যথা করতে থাকে। শরীরটা এখনও অপটু। মদন না এলে সে কি গাঁয়ে ফিরবে একলাই? কিন্তু ওখানে ওর কথা কেউ শুনবে না। বিশ্বাস করবে না কিছু। হাসপাতালের কাগজপত্র দেখালেও না। হয়তো কাগজ টাগজ সব ছিঁড়ে দেবে। আর তার নিজের হেনস্থার কথা ভাবতেই অনঙ্গর সারা শরীর হিম হতে থাকে। একটাই ভরসা, ওর গায়ে হাত দেবে না কেউ। গায়ে হাত ছোঁয়াতে ওদের ভয়। কিন্তু লাঠি বা বাঁশ দিয়ে পেটাতে হাত কাঁপবে না। এমনটিই তো হতে যাচ্ছিল গাঁ ছাড়ার আগে। এতদিনের প্রতিবেশী চেনাজানা লোকগুলো তখন কী ভয়ঙ্করই না হয়ে গিয়েছিল।

অনঙ্গ আবার চারদিকে দেখে। না, মদন বোধহয় এল না। মাত্র কালই বলেগিয়েছিল আসবে। ওদের ওকে নিয়ে যেতে কিছু হয় নি তো! নানা চিন্তা মনে আসে। কিন্তু বড় চিন্তা নিজেকে নিয়ে। সে এখন কোথায় যাবে! এতদিন তো হাসপাতালে যা হোক একটা আশ্রয়ে ছিল! লোকজন যত খারাপ হোক, দু বেলা খেতে দিত। মাথার ওপর ছাদ ছিল। কিন্তু এখন এই কলকাতা শহরের কোথাও তার স্থান নেই! একটা রাতের জন্যও আশ্রয় দেবে না কেউ। আরতির সেজমাসি শিয়ালদার কাছে থাকে। অনঙ্গ সে বাড়িও চেনে। কিন্তু ওখানে ওর ঠাঁই হবে না। গেলে ওরা তাড়িয়ে দেবে। ওর যে রক্তের খারাপ রোগ। আরতিদের বাড়ি থেকে নিশ্চয় খবর পেয়েছে। এখন ডাক্তাররা যাই লিখে দিক, ওরা কিছু মানবে না।

অনঙ্গর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওই তো মদন আসছে—বেশ হন্তদন্ত হয়ে আসছে।

—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ তো? মদন একটু হাসল।

—এত দেরি করলি? আমি সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। অভিমানী গলা অনঙ্গর।

—কী করি বল। ট্রেনটাকে রাস্তায় আটকে দিল। কল্যাণীতে অবরোধ ছিল।

মদন একা আসেনি। সঙ্গে আরও দুজন। মদন পরিচয় করায়, ইনি সুকুমার স্যার। ভাতজংলা স্কুলে পড়ান। আর ইনি সুরঞ্জনদা, কৃষ্ণনগরে থাকেন। একটা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এঁরা চালান। এঁরাও তোমায় নিতে এসেছেন।

—এঁরা কেন? অবাক অনঙ্গ মদনের দিকে চাইল। —আপনাকে আমরা ভাতজংলায় নিয়ে যাব, অনঙ্গবাবু। ওখানেই কটা দিন আপাতত থাকবেন। সুকুমার বলে।

—ওখানে কেন? অনঙ্গ বিহ্বল।

—ওখানে আমাদের সংস্থার একটা ছোট হোম আছে। এই হোমেই কটা দিন থাকবেন। আপনার এখনও ওষুধ ও বিশ্রাম দুটোই দরকার। ক'দিন পরেই নিজের গ্রামে ফিরে যাবেন।

নিজের গ্রামে! অনঙ্গর চোখ দুটি উদ্ভাসিত হতে গিয়েও দ্যুতি হারায়। মনে আসে সেদিনের সেই বিভীষিকার ছবি। —না না, গ্রামে আমি যাব না। ওখানে ফিরলে ওরা আমাকে শেষ কবে দেবে।

—দেবে না। সুরঞ্জন অভয় দেয়। গ্রামের লোক যাতে আপনাকে আর ভুল না বোঝে, তার জন্য আমরা প্রচার চালাব। মানুষকে বোঝাব ওরা কী মারাত্মাব ভুল করতে যাচ্ছিল। আপনার কোনও ভয় নেই, অনঙ্গবাবু। আমরা আপনার সঙ্গেই আছি।

—দাদা, সুরঞ্জনদারা এর মধ্যেই আমাদের এলাকায় কাজ শুরু করে দিয়েছেন। মদন অনঙ্গকে সাহস দেয়।—কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর কথা নয়। সুকুমারদা সুরঞ্জনদা, চলুন, ওপাশের চায়ের দোকানটায় বসা যাক। এক কাপ করে চা এখন সবারই দরকার।

চায়ের দোকানে বসে অনঙ্গর কাগজপত্রগুলো দেখতে দেখতে সুকুমারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। —বাঃ রিপোর্ট তো বেশ ভাল। খামোকা আপনার এত ভোগান্তি হল।

সুরঞ্জনও কাগজগুলো দেখে। —সুকুমারদা, ট্রপিকালে অনঙ্গবাবুর এলিজা টেস্ট এবং ওয়েস্টার্ন ব্লট টেস্ট দুটোই হয়েছে। দুটোতেই এইচ. আই. ভি. নেগেটিভ। অথচ কোনওরকম পরীক্ষা না করতে বলে স্রেফ আন্দাজে একটা মানুষের নিদান হাঁকা হয়েছিল। কেমন সব ডাক্তার একবার ভাবুন।

—তাই বটে। কিছু যাচাই না করেই এর এড্স হয়েছে বলে দিল। এর সঙ্গে ওঠাবসা করলেই নাকি এই রোগ ছড়াবে। এড্স নাকি সাঙ্ঘাতিক ছোঁয়াচে। এসব কথা শুনলে সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বেই। তখন তারা চাইবে এমন কালান্তক ব্যাধির উৎসটিকেই উৎখাত করে দিতে। অনঙ্গবাবুর বেলায় ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল।

—ঠিক বলেছেন, সুকুমারদা। এই রকমই আগে হত কুষ্ঠের বেলায়। কুষ্ঠরোগীকে গ্রামছাড়া করত। এখনও কারও কুষ্ঠ হলে তাকে সবাই এড়িয়ে চলে, যদিও চিকিৎসা করালে এই রোগ সম্পূর্ণ সারে।

অনঙ্গ সব শোনে। —এই অবস্থার কি কোনও প্রতিকার নেই? তার উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা।

—প্রতিকারের জন্যই তো আমরা কাজ করছি, অনঙ্গবাবু। সরকারও ইদানীং কিছুটা নড়েচড়ে বসেছে। রেডিও-টিভিতে কিছুটা প্রচার শুরু হয়েছে। আসলে রোগের বিষয়ে মানুষ যত জানবে, তত তার ভয় কেটে যাবে। তবে সব চেয়ে আগে সমস্ত ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থকর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান থাকা দরকার।

দুই

কৃষ্ণনগর লোকালের একটা কামরায় কোণের দিকের সিটে বসেছিল অনঙ্গ। ওর মনে পড়ে, বুকে স্টেথো লাগিয়েই ডাক্তার সরকার আসল রোগটাকে ধরেছিলেন। পরে একদিন বলেছিলেন, এড্স সেই অর্থে ছোঁয়াচে না হলেও টিবি কিন্তু ভয়ানক ছোঁয়াচে। এই রোগ হলে আক্রান্ত মানুষটিকে একেবারে আলাদা রাখাই উচিত।

হাসি পায় অনঙ্গর। বেশ মজা। টিবি সাঙ্ঘাতিক ছোঁয়াচে, অথচ এই রোগ শরীরে পুষে সদরে—অন্দরে ঘুরে বেড়াও, কেউ গ্রামছাড়া করবে না। এড্সের নামে ক্ষমা নেই। সুকুমারবাবুই ঠিক, অজ্ঞতা সব কিছুর মূলে। তার নিজের অভিজ্ঞতাই প্রমাণ।

আসতে থাকে। চোখ বুজতেই সেদিনের ঘটনাগুলো পরপর মনে আসে। ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিল সে মা দুর্গা ক্লিনিকে। অসুবিধাগুলোর কথা বলতেই অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবু তার নাড়ি ধরলেন, চোখ ওল্টালেন, পেটেও চাপ দিলেন। তারপর শরীরের নানা জায়গায় স্টেথো বোলালেন। শেষে গম্ভীর মুখে বললেন, তোমার রক্তের রোগ, যাকে এড্স বলে তাই মনে হচ্ছে।

এক মুহূর্তে অনঙ্গর পায়ের তলায় পৃথিবীটা দুলে উঠল। এ রোগের কথা সে শুনেছে।

—এ রোগের চিকিৎসা নেই, ডাক্তারবাবু? অনঙ্গর গলা দিয়ে শব্দগুলো কঁকিয়ে ওঠে।

—না, এ প্রাণঘাতী ব্যারামের কোনও ওষুধ এখনও বার হয়নি।

—ডাক্তারবাবু, আমাকে বাঁচান। অনঙ্গ ডাক্তারের পা দুটো ধরতে যায়।

—আরে কী করছ? চেয়ার ঠেলে সরে দাঁড়ান প্রবীণ ডাক্তার। এ রোগ খুব ছোঁয়াচে। তুমি কারও কাছে একদম যাবে না। তোমায় এখন আলাদা থাকতে হবে। পরিবারের থেকেও আলাদা। নইলে তোমার থেকে এই মারণ রোগ অন্যেরও হবে।

—ডাক্তারবাবু, আমি এখন কী করব? এর চেয়ে যে আমার মরণ হওয়া ভাল ছিল। অনঙ্গ ডুকরে ওঠে।

প্রবীণ ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে অনঙ্গকে পরিমাপ করেন। অনঙ্গ, তুমি কলকাতায় যাও। ওখানে বড়বড় ডাক্তার আছে, আছে নামী হাসপাতাল। ওখানেই কিছু একটা ব্যবস্থা হবে। কলকাতায় না পার, অন্তত শক্তিনগর হাসপাতালে যাও। ওখানেও ভাল ডাক্তার আছে।

অনঙ্গ কিছু বলতে যাচ্ছিল, ডাক্তার মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে। —যাও অনঙ্গ। ব্যাপারটা জানাজানি হবার আগেই কলকাতা বা শক্তিনগরে চলে যাও। এখানে থেকো না। একবার চাউর হয়ে গেলে তোমাদের খুব মুশকিল হতে পারে।

ভাসমান তৃণখন্ড আঁকড়ে ধরবার একটা মরীয়া প্রচেষ্টায় বিষণ্ণ অনঙ্গ উঠে দাঁড়ায়।—ডাক্তারবাবু, আপনার কোনও ভুল হচ্ছে না তো?

প্রৌঢ় ডাক্তারবাবুর মুখে আত্মবিশ্বাসের হাসি ফোটে। —ভুল! এই যে তোমার ওজন কমে যাচ্ছে, শরীর ক্রমশ দুর্বল লাগছে, ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছে, এ সবই সেই কাল রোগের লক্ষণ। তাও হয়তো অন্য কিছু ভাবতাম। কিন্তু তোমার ওই কাশি। প্রায় সময়ই কেশে যাচ্ছ। এর ওপর তিন বছর বোম্বেতে ছিলে। বয়সের ছেলে, পরিবার ছেড়ে বেশিদিন বাইরে থাকলে এ সব রোগ হতেই পারে।

—ডাক্তারবাবু, ওখানে দেশের লোকেরা সবাই এক সঙ্গে ছিলাম। বেচাল কিছু হয়নি।

—হুঁ সব সাধু পুরুষ। থামো বাপু, কথা বাড়িও না। একটা ওষুধ দিলাম, খেয়ো। একটু জোর পাবে। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, কলকাতা বা সদরে যাও। এ গাঁয়ে আর একদিনও থেকো না।

মা দুর্গা ক্লিনিক থেকে অনঙ্গ বেরিয়ে আসে। বাইরের চেনা মুখগুলো অচেনা লাগে। এখন কি সে বাড়ি যাবে! ওখানে আরতি আছে, তার বউ। বাবা-ভাই আছে। কে কী ভাবে নেবে ব্যাপারটা, সেটাই এখন চিন্তা। ওরা কি অনঙ্গকে সন্দেহ করবে? ঘেন্না করবে? ভয় পাবে? না, অনঙ্গ ব্যাপারটা এখন গোপন রাখবে। কিন্তু একসঙ্গে থাকতে ডাক্তারবাবু যে মানা করল। এক সঙ্গে থাকলে ওদেরও নাকি এই কালব্যাধিতে ধরবে। এর মধ্যেই আরতির শরীরে ও নিশ্চয় বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে। আরতি আবার মা হতে চলেছে। অনঙ্গ নিজে তো গেছেই, ছেলে-বউকেও রেহাই দেবেনা। হায় ঈশ্বর, একী নিয়তি!

কিন্তু রোগ চেপে রাখাও করা ঠিক হবে না। অনঙ্গ কলকাতায় ডাক্তার দেখাবে। কিন্তু টাকা কোথায়? মুম্বইতে কষ্ট করে থেকে যা জমিয়েছিল, তাই দিয়ে এখানে একটা ছোট কাপড়ের দোকান করেছে। হাতে নগদ কিছু নেই। সে গেলে দোকানটাই বা কে চালাবে? আরতি পারবে না। ওর ছেলেটা চার বছরের মাত্র। পেটে আরও একটা। বাবার বয়স হয়েছে, কোনও হিসাব থাকে না। মদনেরও অভিজ্ঞতা নেই। দোকানটা না চালাতে পারলে সবাই না খেয়ে মরবে। না, অনঙ্গ কলকাতায় যাবে না। এখানেই থাকবে, রোগের কথা কাউকে জানাবে না। তবে বাড়িতে সন্ন্যাসীর মতো থাকবে। আলাদা খাওয়া-শোওয়া, আলাদা সব কিছু। বলবে, তার গুরুর নির্দেশ। ব্রহ্মচর্য করতে হবে সকলের মঙ্গলের জন্য।

যা ভাবা তাই কাজ। বাড়িতে এসে অনঙ্গ নিজের কাপড় চোপড়, বিছানা, গামছা, থালা-বাটি সব পৃথক করে নিল। সবাই অবাক। কী হল ওর হঠাৎ! অনঙ্গর ব্যাখ্যা, ব্রহ্মচর্য পালনে মনস্কামনা পুরবে।

বুড়ো বাবা আর মদনকে বুঝ দিতে পারলেও আরতি না ছোড়। রাত বাড়লে ঘুমন্ত ছেলেকে একা রেখে পায়ে পায়ে সে অনঙ্গর ঘরে চলে আসে। অনঙ্গ তখনও

শোয়নি। আরতিকে দেখে চমকে ওঠে। কে?

—নিজের বউকে চিনতে পারছ না?

—আরতি! তুমি ঘুমোওনি?

—ঘুম আসছে না। তুমি চলো, শোবে।

আঁতকে ওঠে অনঙ্গ। —তা হয় না।

—কেন হয় না?

—তুমি এখন যাও, লক্ষ্মীটি। আমি এখন জপে বসব।

—কীসের জপ? আরতি অনঙ্গর গলা জড়িয়ে ধরে। ওর চিবুকে নিজের ঠোঁট ছুঁইয়ে বলে, তোমার জপতপ সব আমারই জন্য।

আরতির আদর অনঙ্গকে বিচলিত করলেও কাশির ফাঁকে সে নিজেকে সংযত করে। —গুরুর বারণ, আরতি। তুমি এখন যাও।

আরতি আরও নিবিড় হয়। অনঙ্গর মুখে বুকে হাত বুলিয়ে বলে, তুমি কত রোগা হয়ে গেছ গো। ইস গা-টাও সব সময় গরম গরম লাগে। আর ওই বিতিকিচ্ছিরি কাশি। সব সময় খুকখুক করছ। তুমি ভাল কোনও ডাক্তার দেখাও গো।

আরতির আদরে, সমবেদনায় ও উদ্বেগে অনঙ্গ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। সে ভেঙ্গে পড়ে। —ডাক্তার আমি আজকেই দেখিয়েছি, মা দুর্গার ডাক্তার।

—কী বলল ডাক্তারবাবু? ভয়ের কিছু নেই তো? আরতির মুখে শঙ্কা।

অনঙ্গ উত্তর দেয় না। আরতির উদ্বেগ বাড়ে। —কী বলেছে ডাক্তার? চুপ করে আছ কেন?

অনঙ্গ হাল ছেড়ে দেয়। জেরার মুখে সত্যি কথাই বলে। বলেছে খারাপ অসুখ হয়েছে। কলকাতায় বড় ডাক্তার দেখাতে হবে।

—কী অসুখ হয়েছে? উৎকণ্ঠিত আরতি জিজ্ঞাসা করে। অনঙ্গর প্রতিরোধ ভেঙ্গে যায়। —নাম বলেনি। বলেছে রক্তের রোগ।

—আর কী বলেছে ডাক্তার? আরতি চোখ সরু করে।

—বলেছে এ রোগ খুব ছোঁয়াচে। তাই আলাদা থাকতে হবে। তোমাদের সবার জন্য আমার বড় চিন্তা। আরতির পেটে হাত রাখে অনঙ্গ। —যেটা এখানে বাড়ছে সেটার জন্যও।

ত্বরিতে আরতি নিজেকে আলগা করে নেয়। তফাতে সরে গিয়ে গলা তোলে, রক্তের খারাপ রোগ বাধিয়েছ? বাঃ। তোমার এমন জঘন্য মতি! ছিঃ।

ঘর ছাড়তে গেলে অনঙ্গ আরতির পথ আটকায়। —দাঁড়াও আরতি। তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু সত্যি নয়।

এক ধাক্কায় অনঙ্গকে সরিয়ে দিয়ে তীব্র কণ্ঠে আরতি বলে, এসব কথা সবাই বলে। ধরা পড়লে সাধু পুরুষ হতে চায়। তুমি একটা ভণ্ড, লম্পট কোথাকার।

চলে যেতে যেতেও আরতি ঘুরে দাঁড়ায়। —আমি সোনাকে নিয়ে কাল বাপের বাড়ি যাব। ওখানে যাবার চেষ্টা করবে না। নিজে গেলে বা কাউকে আনতে পাঠালে কেলেঙ্কারি করব।

আরতি চলে যায়। অনঙ্গর বুকের মধ্যে কষ্ট ঢেউ দিল। আরতি ওকে ভুল বুঝেছে।

পরের দিন সকালে আরতি সত্যিই চলে গেল। এখন কী করবে অনঙ্গ বুঝে উঠতে পারে না। সারাটা দিন নিজেকে ঘরবন্দি করে রাখে। বুড়োবাবা ডাকে, ও অনঙ্গ, বউমার হঠাৎ কী হল? মদন সান্ত্বনা দেয়, বউদিদি কদিন গেলেই ফিরে আসবে।

দুটো দিন কেটে গেল, আরতি ফিরল না। তৃতীয়দিন সন্ধ্যার পর পঞ্চায়েত মেম্বার ব্রজনাথবাবুর সঙ্গে দশ-বারো জন গাঁয়ের লোক এল। নেদো, বুড়োদা, তারিণী খুড়ো, জটার বাবা, আলতাফ চাচা, মান্টি এরাও আছে। সবাই ক্ষ্যাপা শেয়ালের মতো কামড়াতে চায়। খানিক তফাতে আরও এক দল দাঁড়িয়ে। হাতে লাঠি, চোখে জ্বলন্ত মশাল। ক্রুদ্ধ গর্জন এবং আস্ফালনের শেষে ব্রজনাথবাবুরা আলটিমেটাম দিল, কাল সকালেই অনঙ্গ যেন গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। দুর্গা ক্লিনিক থেকে তারা সব শুনেছে। অনঙ্গ গ্রাম না ছাড়লে ওদের বাড়িতে আগুন দিয়ে সবাইকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে।

অতএব অনঙ্গকে বাড়ি ছাড়তেই হয়। গ্রামও। বাবার চোখের জল আর মদনের ভ্রূকুটির মধ্যে সে ভোরের ট্রেন ধরে। কৃষ্ণনগর থেকে শক্তিনগর হাসপাতাল। সেই থেকেই অনঙ্গর ভেসে বেড়ানো।

শক্তিনগর হাসপাতালে অনঙ্গর যে অভ্যর্থনা জুটল তার জন্য সে প্রস্তুতই ছিল। আরতি চলে যাওয়াতে সে বুঝে গিয়েছিল সম্মানের জীবন তার শেষ। এখন থেকে ঘেয়ো কুকুরের জীবন ওর নিয়তি।

দুর্গা ক্লিনিকের ডাক্তারবাবুর রিপোর্ট দেখার পর অনঙ্গর ঠাঁই হয় হাসপাতালের একটা ভাঙ্গা ঘরে। জায়গা হল একটা ছেঁড়া কম্বলের ওপর মেঝেতে। নার্স-ফোর্থগ্রেড কেউ তার কাছে গেল না। এমনকী কোনও ডাক্তারও নয়। শেষ পর্যন্ত সুপারকেই আসতে হল। তিনি দেখলেন। এ রোগের কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা এই হাসপাতালে নেই বলে অনঙ্গকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে দেওয়া হল।

শক্তিনগর থেকে মেডিক্যাল কলেজ—সর্বত্র প্রায় এক চিত্র। অবহেলা, উপেক্ষা, ঘৃণা আর ছোঁয়াচ বাঁচানোর সযত্ন প্রয়াস। অনঙ্গ যেন একটা খাঁচা ভাঙ্গা বুনো বাঘ, খুনি মাতালের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর।

মেডিক্যাল কলেজে এসে অবশ্য অনঙ্গর কপাল খুলে গেল। ডাক্তার সরকার ওকে পরীক্ষা করলেন, পরীক্ষার জন্য রক্ত নেওয়ালেন। ওষুধও দিলেন। প্রথমবার রক্ত পরীক্ষার পর আবার পরীক্ষা। আরও ক'বার। বুকের ছবি, থুতু পরীক্ষা। যত পরীক্ষা হয়, অনঙ্গ তত ভরসা পায়, ও ভাল হয়ে যাচ্ছে।

ভাল হয়েই আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে অনঙ্গ। আর পাঁচজন ট্রেনযাত্রীর মতো ও এখন মুক্ত। ওর আর কোনও ভয় নেই। ও ফিরে পাবে ওর ঘর-সংসার। কিন্তু সত্যিই কি সে ফিরে পাবে? আরতি বলে গেছে সে ফিরবে না। যদি বা ফিরেও আসে, আগের সেই আরতি হতে পারবে কি? অনঙ্গ জানে

একবার রেশমী সুতো ছিঁড়ে গেলে হয়তো আবার তা জোড়া যায়। কিন্তু তাতে গেরো পড়ে। গেরোটাই বাকি জীবনের ছন্দ নষ্ট করে দেয়।

রানাঘাট ছাড়িয়ে যেতেই ফিসফিস করে মদনকে আরতির কথা জিজ্ঞাসা করে অনঙ্গ। গ্রাম ছাড়ার পর এই প্রথম। আরতি কি জানে তার রক্তে কোনও খারাপ দোষ পাওয়া যায়নি?

—বউদিদি সব জানে। সে তো এখন আমাদের বাড়িতেই আছে।

—সেকিরে! বিস্ময়ের শব্দ করে অনঙ্গ।

—হ্যাঁ। বউদিদি জানে হাসপাতাল থেকে তুমি আজ ছাড়া পাচ্ছ। তবে জানে না তুমি কালিকাপুরে না ফিরে ভাঙজংলায় এখন থাকবে।

কী কথা বলল মদন! আরতি ফিরে এসেছে। সে যে বলেছিল আর কোনওদিন ফিরে আসবে না।

—হ্যাঁরে মদন, আবার অনুচ্চ কণ্ঠ অনঙ্গর, তোর বউদিদি একদিনও হাসপাতালে আসেনি কেনরে?

মদন হাসল। —কী করে আসবে? ছিল তো বাপের বাড়িতে নিজের শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে। তবে আজ আসতে চেয়েছিল। আমি আনিনি। ওদিকে তো সময় হয়ে আসছে।

মদনের কথা শুনে অনঙ্গর মনটা উল্লাসে নেচে ওঠে। আরতি তার বাপের ঘরে স্বামীর রোগের কথা বলেনি। বলেছে নিজের শরীর খারাপের কথা। আজ সে আসতেও চেয়েছিল। ওরে মদন, তুই কী খবর দিলি ভাই! এতদিনের জমাট মেঘ কি সরে যাচ্ছে? অশ্রুত একটা মধুর রাগিনী অনঙ্গর হৃদয়ের গোপন তন্ত্রীতে বেজে উঠল। পরম সুখে সে কাঠের সিটটায় পিট ঠেকিয়ে চোখ বোজে। এখন সে নির্ভার

স্বপ্নের ঘর ছেড়ে

তেতলা ঘরের লাগোয়া ছোট বারান্দাটায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল দেবিকা। খানিকটা তফাতের পলেস্তারা খসে পড়া জীর্ণ চেহারার বাড়িটার দিকে অন্যমনস্ক চোখ পড়ে ওর।

বাড়িটার ছাদে কটি বাচ্চা খেলা করছে। দুটিকে দেবিকা চিনতে পারল। ওই বাড়িটার দোতলায় ওরা থাকে। খুব হুড়োহুড়ি করছে ছেলেমেয়েগুলো। ওদের উল্লাসের শব্দ দেবিকা তার বারান্দায় দাঁড়িয়েও শুনতে পাচ্ছে।

' কি দেখছ এত গভীর ভাবে?' শেখর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কখন।

'বাচ্চাগুলো কেমন হুল্লোড় করছে দেখ।'

'হুঁ।' শেখর সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।

'দেখ দেখ, এ পাশে রাস্তার ধুলোয় কটা বাচ্চা গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওদের দেখার কেউ নেই।'

দেবিকার দৃষ্টি অনুসরণ করে শেখর তাকায় গাড়িখানার বড় রাস্তাটার দিকে। বরাকর রোডে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ট্রাক এবং বাস অনবরত ছুটে যাচ্ছে। ব্যস্ত এই রাস্তার কিনারায় চারটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হুটোপুটি করতে করতে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ছে।

'ওদের কেউ রাস্তা থেকে সরিয়ে দিচ্ছে না কেন?' দেবিকার গলায় উৎকণ্ঠা। 'রাস্তার ওপর এত হুড়োপাটা করলে একটা না একটা নির্ঘাত গাড়ি চাপা পড়বে।'

এক পলক বাচ্চাগুলোকে দেখে নেয় শেখর। সে মাথা নাড়ে। 'ওরা কেউ এত তাড়াতাড়ি মরবে না। অবশ্য একটা-দুটো গেলেও চিন্তা নেই।'

'সেকি গো!' গেলেও চিন্তা নেই মানে?'

'বুঝলে না? শেখরের ঠোঁটের কোণা বেঁকে যায়। 'বছর বছর ওদের ভাইবোন জন্মাচ্ছে। একটা গেলে দুটো আসবে।'

দেবিকা উত্তর দেয় না। শেখরের কথাগুলো ওরক কানে নিষ্ঠুর লাগে। ওর মুখে অন্ধকার ছায়া নামে। অপাঙ্গে সে একবার শেখরকে দেখে। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সামনের বাড়িটার দিকে দৃষ্টি মেলে। ছাদের ওপর বাচ্চারা সমানে হুড়োহুড়ি করছে। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ও বাড়িটারই দু জন বয়স্ক বাসিন্দা। সম্ভবত ওরা স্বামী-স্ত্রী। ওরা বোধহয় কিছু বলে বাচ্চাদের। এবার বাচ্চারা গান ধরেছে। হাততালি দিয়ে তাল দিচ্ছে বয়স্ক দুজন। দেবিকা গান শুনতে পাচ্ছে। ওর খুব ভাল লাগতে থাকে। ওর মনে হয় আহা, সে আর শেখরও যদি ওদের কোরাসে যোগ দিতে পারত। শেখরের দিকে ঘাড় ফেরায় সে। কোথায় শেখর! যেমন এসেছিল তেমনই নিঃশব্দে সে চলে গিয়েছে।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে দেবিকা। না, এখন আর ভাল লাগছে না। একটু আগের ভাল লাগাটা খুব দ্রুত কান্নার মেঘ হয়ে মনের গহনে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বারান্দা ছেড়ে সে নিজের ঘরে চলে আসে।

সন্ধ্যা হতে বাকি থাকলেও ঘরের ভেতর অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে

দেয় দেবিকা। উজ্জ্বল ফ্লুরেসেন্ট আলো হেসে ওঠে। ঘরের বাতাস ফুলের গন্ধে ভারী। বিকেলের আগেই টাটকা রজনীগন্ধার গুচ্ছ দিয়ে দেবিকা বড় বড় দুটো ফ্লাওয়ার ভাস ভরেছে। এক গুচ্ছ গোলাপও রেখেছে জাপানি একটা ভাসে। সেটা রাখা ড্রেসিং টেবিলের ওপর। শুধু আজ নয়। রোজই দেবিকা ফুলদানি ভরে ফুল সাজায়। অনেক দিন মালাও গাঁথে। ঝাড়লণ্ঠনের মতো করে মালাগুলোকে ঝুলিয়ে দেয় কখনও সখনও। সুগন্ধি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেয়। সারা ঘর ফুলের সুবাসে ও ধূপের গন্ধে ভরে গেলে দেবিকা ফ্লুরেসেন্ট বাতিটা নিভিয়ে হাল্কা নীল রঙের আলো জ্বেলে দেয়। ঘরের ভেতর তখন একটা স্বপ্নের জগৎ তৈরি হয়। এ জগতে থাকে দেবিকা তার সবটুকু ভাললাগা-ভালবাসা নিয়ে। প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি রাত্রে।

অন্য অন্য সন্ধ্যার মতো আজও দেবিকা বিছানায় আধশোয়া হয়ে মাথার কাছে রাখা টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে নেয়। হাতে তার প্রিয় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বই। বইটা খুলে ধীরে ধীরে একটা পাতা পড়তে শুরু করে—

'প্রিয়তমা, তুমি কোথায়?
প্রতিধ্বনির তরঙ্গে,
চোখের তারায়।
তাহলে এসো,
অন্ধকার উদ্ভিন্ন করি
পৌঁছে যাক সকাল।'

না ভাল লাগছে না। জীবনানন্দের কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়ে—

'পৃথিবীর পুরনো সে পথ
মুছে ফেলে রেখা তার—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয়।'

না। জীবনানন্দও ভালো লাগছে। আসলে কিছুই আজ দেবিকার মনে সাড়া তুলছে না। তার কী হয়েছে কে জানে। অথচ রোজই সন্ধ্যা হলে সে ফুল সাজায়, ধূপ জ্বালে, কবিতা পড়ে। তার তখন মনে হয় এক স্বপ্ন বাসরে তার বাস। সে যেন মাটির পৃথিবীর সুখ দুঃখের অনেক ঊর্ধ্বে। কিন্তু আজকের স্বপ্ন বাসরে সে যেন কাঙ্খিত নয়। ও বাইরের ধুলোমাখা পৃথিবীর লোক। দেবিকার মনের মধ্যে আষাঢ়ের ছায়া নামে। বিষণ্ণ নির্জনতায় সে হাঁফিয়ে পড়তে পড়তে বই বন্ধ করে উঠে পড়ে। বাইরের বারান্দাটায় এসে দাঁড়ায়।

প্রায় পাঁচ বছর ওদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু আজই প্রথম সন্ধ্যা যখন কবিতা পড়তে দেবিকার ভাল লাগল না। আজকের সন্ধ্যাটা কি কোনও সঙ্কেত নিয়ে এসেছে! সামনের বাড়িটার দিকে চোখ যায় দেবিকার। ও বাড়ির ছাদে কেউ নেই। কটা জানলা দিয়ে আলো বাইরে ছিটকে আসছে কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দেবিকার মনে পড়ে কবিতা পড়া নিয়ে সে বিয়ের আগে কত বকুনি খেয়েছে। সবাই বকুনি দিয়েছে—মা, বাবা, দাদা। গোঁড়া রক্ষণশীল ঘরের মেয়ে লেখা পড়া শিখেছে তাই অনেক। আবার দিন নেই, রাত নেই পদ্য পড়া কেন! আদিখ্যেতার একটা সীমা

থাকে। দেবিকার যেন সে সব নেই।

ওর মনে পড়ে পুলকের কথা। ওদের একতলার পুরনো ভাড়াটের ছেলে। এই পুলকই প্রথম দেবিকাকে কবিতা শোনায়।

'দে দোল দোল।
দে দোল দোল।
এ মহাসাগরে তুফান তোল।
বধূরে আমার পেয়েছি আবার, ভরেছে কোল।'

মিষ্টি গম্ভীর গলায় ভারী সুন্দর আবৃত্তি করেছিল পুলক। দেবিকা মুগ্ধ।

'তুমি এত ভাল আবৃত্তি করতে পার, জানতাম না।'

'কোথায় আর ভাল আবৃত্তি করতে পারি! সৌমিত্র চ্যাটার্জির আবৃত্তি শুনেছ কখনও? আমাদের কলেজের প্রাণতোষ বাবুর আবৃত্তি? শুনলে বুঝতে আবৃত্তি কাকে বলে। কবিতা পড়তে তো সবাই পারে। কিন্তু ওঁদের মতো করে পড়া? মন উচাটন হয়ে যায়।'

'কবিতা পড়া এমন হয় নাকি!' দেবিকা বিস্ময় প্রকাশ করেছে। 'আমি তো জানি পড়ার মতোই কবিতা পাঠ এক ঘেয়ে। এক কথায় আবৃত্তি মানে এক সুরে যাওয়া কথামালা।'

'তাই বটে! আমি যে এক্ষুনি কবিতা পড়লাম তা কি তোমার কাছে পাঁচালি ড়ার মতো মনে হল?'

'না। ভাল লাগল খুব। তুমি আমায় রোজ কবিতা শোনাবে, পুলক?'

'আমার কবিতা তোমার ভাল লাগবে না, দেবি।'

'কেন লাগবে না? আজ তো বেশ লাগল।'

'সত্যি বলছ?' পুলকের গলায় খুশি ঝরে পড়ে।

'হ্যাঁ সত্যি।' দেবিকার দৃষ্টি গাঢ় হয়।

'বেশ, যতদিন তোমার কবিতা পড়া শুনতে ভাল লাগবে, ততদিন তোমায় আমি শুনিয়ে যাব।'

সেই শুরু। প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও সময়ে এসে পুলক দেবিকাকে শুনিয়ে গেছে। কিন্তু ক'দিনই বা! রক্ষণশীল পরিবারের নানা বাধা নিষেধে ড়াটের ছেলে পুলকের ওপরে ওঠাই বন্ধ হয়ে গেল।

দুঃখ পেয়েছিল দেবিকা। তার জন্যই পুলকের এত অসম্মান। কিন্তু তার কীই করার আছে! সে তো অসহায় দর্শক মাত্র। পারিবারিক বিধি নিষেধের বেড়াজাল ইচ্ছে মতো মুক্ত হাওয়ায় ছুটে যাওয়ার উপায় তার নেই। কিন্তু ওর মনে লকের নিত্য যাওয়া আসা বন্ধ করবে কে! এখানে কোনও সংস্কার আর অনুশাসন মানে না।

এরপর একদিন দেখা হয়েছিল পুলকের সঙ্গে। হঠাৎই বলা যায়। কলেজ থেকে ফেরার পথে। পুলক ওকে এড়িয়ে যাচ্ছিল কিন্তু পারল না। দেবিকা ওকে ডাকে। ়মি আমাকে না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছ কেন, পুলক?'

মাথা নিচু করে অপরাধ স্বীকার করে পুলক। 'দেবি, আমি সাহস পাইনি।'

'কেন? আমি কী দোষ করেছি তোমার কাছে?' 'তুমি কেন দোষ করবে, দেবি? আসলে আমার জন্য তোমার কপালে বিড়ম্বনা জুটুক তা আমি চাই না কখনও।'

দেবিকার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। 'সত্যিই পুলক, অকারণে তোমাকে কত অপমান সইতে হয়েছে। সে সব তো আমারই জন্য।'

'এ সব কথা থাক, দেবি। আমরা তো সত্যিই এখনও এমন সংস্কার মুক্ত সমাজে বাস করিনা যেখানে আমাদের মেলামেশা সবাই উদার দৃষ্টিতে দেখবে। তাই দোষ তোমারও নয়, আমারও নয়, তোমার অভিভাবকদেরও নয়। সে যাক, কবিতা পড়ছ তো? কবিতা পড়তে এখনও ভাল লাগছে নিশ্চয়?'

ওরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিল। দেবিকা তাকায় পুলকের দিকে। চোখে চোখ রাখে। লাজুক হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে। 'হ্যাঁ, ভাল লাগছে। বরং এখন আরও বেশি ভাল লাগছে। কবিতা যেন তোমার কথাই আমায় বলে।'

'আমি বুঝতে পারছি না দেবি, তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ।'

'বুঝলে না? কবিতা পড়বার সময় রোজই মনে হয় তুমি যেন আমার পাশে বসে কবিতা পড়ছ আর আমি শুনছি। কবিতা যেন তোমার না বলা কথাগুলো আমায় শুনিয়ে যায়।'

'আমার না বলা কথা!' পুলক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। 'দেবি, আমায় ভুল বুঝোনা। তুমি আর কবিতা পোড়ো না।'

দেবিকা হঠাৎ করে উত্তর দেয় না। ও বুঝতে পারে পুলক কী বলছে চাইছে। চলার গতি ধীর করে সে। মনের সব দ্বন্দ্ব সরিয়ে সে বলে, 'তা হয় না, পুলক।'

'কেন হয় না?'

'কবিতার মধ্যে দিয়ে যে তুমি আমি একাত্ম হয়ে গেছি।'

দুজনের চোখে চোখ আটকে যায়। চোখের ছায়া পড়ে মনে। গভীর অনুভূতির জগতে দিশাহারা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পুলক ডাকে, 'দেবি।'

'বল'।

'একটা কবিতা শুনবে?'

'নিশ্চয়। এ কথা তোমায় আমি বলব ভাবছিলাম। মনে হচ্ছে বহুদিন তোমার অপূর্ব কণ্ঠের আবৃত্তি শুনিনি।'

চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় পুলক। ধারে কাছে বিশেষ লোক নেই। বেলা পড়ে আসছে বটে, তবে পুবের এই রাস্তাটায় লোক চলাচল বরাবরই খুব কম। সুরেলা কণ্ঠে পুলক শুরু করে—

আমরা কোথায় চলেছি! কোথায়! কোথায়!
এ প্রাণ অনির্বাণ দীপ শিখা—
হঠাৎ হাওয়ায় নিভু নিভু আলো।
কী নিয়ে বাঁচব বল, কী আছে আমার।
    এ' জীবন কি অসীম?
    কী আছে এখানে?

সারা প্রাণ জুড়ে মরুভূমি—লাভা স্রোত।
আছে, তবু আছে চোখ ভরা জল তোমার আমার।
একটু থেমে পুলক বলে যায়—
আমায় একটু সুর দেবে কেউ!
একটু আকাশ!
আলো আলো জীবনের চোরা স্রোত।
আশ্চর্য পাখি তোমার দু চোখ—
দুটি মুক্তোর মালা।

পুলক থামলে দেবিকা গভীর আবেগে ওর বাঁ হাতটা নিজের ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে। ওরা কেউ কথা বলে না। ধীর পায়ে নিঃশব্দে হাঁটে। হাতে হাত জড়ানোই থাকে। কতক্ষণ পরে পুলক থামে। সাবধানে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়। 'দেবি।' রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে সে।

'কিছু বলবে? বল পুলক, তোমার কথা বল।'

'আমি লিখেছি এ কবিতা।'

'তুমি! সত্যি?'

'হ্যাঁ, হঠাৎই লিখে ফেললাম।'

'আরও লেখো। তুমি খুব বড় কবি হও পুলক।' দেবিকার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওর দিকে তাকিয়ে পুলক হাসে। 'ইচ্ছে হলেই কি কবি হওয়া যায়, দেবি? আসলে নিজের ইচ্ছেতে অনেক কিছুই হয় না।'

'পুলক, শুধু ইচ্ছেতে হয় না মানি। সেজন্য চেষ্টাও থাকা চাই। তুমি চেষ্টা করো। লেখো। আশা রাখো। সাহস রাখো। সফল তুমি হবেই।'

'দেবি, চেষ্টা আমি নিশ্চয় করব! কবিতার মধ্যে আমি বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু আমার ভয় করে বড়।'

'কিসের ভয়, পুলক?'

'কবি হবার আগেই আমি যদি হারিয়ে যাই! আমাদের মতো বাড়ির ছেলেদের অনেক কিছুতেই হার হয়। তাই কবিতার কাছেও যদি আমার হার হয়! হারতে হারতে হারিয়ে যাই যদি একেবারে?'

'এমন কথা মনেও এনো না পুলক। তুমি হারবে না, তাই তুমি হারাবেও না। আর যদি শেষ পর্যন্ত হেরেও যাও, আমার কাছ থেকে কবি পুলক কোনওদিনও হারিয়ে যাবে না।'

'দেবি! তুমি কি ঠিক বলছ?'

'নিশ্চয় ঠিক বলছি। কবি পুলকের স্থান আমার হৃদয়ে।'

'দেবি,' পুলকের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'তুমি আমায় নতুন প্রেরণা দিলে। আমি লিখব। অনেক কবিতা লিখব। তোমার কাছে পুলকের কবি সত্তা চির নতুন হয়ে উঠবে।'

দেবিকার হাতে জোরে চাপ দিয়ে চাপ শিথিল ক'রে পুলক। 'আমার আর কিছু চাওয়ার নেই, দেবি। তোমার সঙ্গে আর দেখা না হলেও আমার খেদ থাকবে না।

আমি জানব একজন অন্তত আমার কবিতাকে তার মনে স্থান দিয়েছে।'

'এবার বাড়ি চলো। দেরি হয়ে গেছে অনেক। সুবিধা মতো তোমার কবিতাগুলো আমায় পাঠাবে।'

'পাঠাব দেবি, নিশ্চয় পাঠাব। তোমার ভাল লাগলে সেগুলো দিয়ে বই ছাপাব। সে বই উৎসর্গ করব তোমায়। উৎসর্গ পত্রে কী লিখব জান?'

'কী লিখবে?'

'আমার মিতাকে।'

'বাঃ। খুব সুন্দর। আশা করছি তুমি খুব তাড়াতাড়ি আমায় একগুচ্ছ কবিতার ফুল পাঠাবে?'

'নিশ্চয়।'

দেবিকা পুলকের হাত ছাড়ে না। ওরা হাঁটতে হাঁটতেই বাড়ির পথ ধরে।

অকস্মাৎ দুর্ঘটনাটা ঘটল এবং পুলকের আশংকাই সত্যি হল। কটা মাত্র কবিতা সে দেবিকাকে পাঠাতে পেরেছিল। তারপরই এল সেই দুঃসংবাদ। পুলক হারিয়ে গেছে। এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়েছে। হাবড়া থেকে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে কলকাতায় ফিরছিল সে। হঠাৎ হাত ফস্কে সব শেষ।

এই মর্মন্তুদ সংবাদ পেয়েও দেবিকা কাঁদল না একটুও। প্রাণপণ প্রয়াসে অন্তরের সমস্ত আবেগকে সে সংহৃত করল। তারপর পুলকের পাঠানো কবিতাগুলোকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে অস্ফুটে বারবার বলল, 'পুলক, তুমি আমার কাছ থেকে হারাবে না, কোনওদিনও না। কবিতার মধ্য দিয়ে তোমাকে পেয়েছি, কবিতাতেই তুমি আমার কাছে চিরকাল বেঁচে থাকবে।'

ওর কাছ থেকে পুলক আজও হারায়নি, দেবিকা ভাবে। এতগুলো বছর পুলক ওর সঙ্গেই আছে। বাকি জীবনটাও থাকবে। পুলকতো দেবিকার কাছে বেশি কিছু চায়নি। চেয়েছিল স্মরণের প্রতীতি দু ফোঁটা চোখের জল। সে চেয়েছিল বিস্মরণে হারিয়ে না যেতে। পুলক, তোমার দেবিকার কাছ থেকে তুমি কোনওদিন দূরে সরে যাবে না। ভাবতে ভাবতে দেবিকার দু'চোখ সজল হয়ে ওঠে।

দেবিকার মনে পড়ে শেখরের জন্যই তো সে পুলককে তার স্মৃতির মণিকোঠায় এত উজ্জ্বল করে রাখতে পেরেছে। সংস্কার বিরোধী রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম নিয়েও শেখর শিক্ষিত এবং উদার। সে কবিতাও মোটামুটি পছন্দ করে। বিয়ের পর থেকেই তাই দেবিকা ইচ্ছে মতো কবিতার বই কিনেছে। শেখর কোনওদিন বাধা দেয়নি। কখনও বা সে নিজেই নতুন বই এনে দিয়েছে। প্রথম প্রথম সে দেবিকাকে বলত কবিতা পড়ে শোনাতে। আজকাল অবশ্য তেমন অনুরোধ করে না। ওর কাজের চাপ সমানে বেড়ে যাচ্ছে। নানা ধরনের ব্যবসার দায় চেপেছে পারিবারিক সূত্রে। নিজেও ধরেছে নতুন দুটি কাজ।

শেখরকে দোষ দেয় না দেবিকা। কবিতা না শুনুক ও। বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত সে কিন্তু দেবিকার কোনও ইচ্ছা বা কাজে বাধা দেয়নি। ফুল ভালবাসে দেবিকা। নিয়মিত ফুল আসে ওর জন্য। স্বপ্নালু মোহের জগৎ রচনা করতে চায় সে। স্বপ্ন বাসরের সে চির-অধিবাসী হতে চায়। আজও তাই দেবিকাই তার স্বপ্ন

বাসরের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবিকার এই সব খেয়ালে এক দিনের জন্যও বাদ সাধেনি শেখর। কিন্তু হোলসেল আর রিটেলের কারবারী শেখর অগ্রবাল তো জানেনা তার প্রিয় বধূ যে বাসর ঘর প্রতিটি সন্ধ্যায় সাজায়, তার উপলক্ষ্য সে নয়। এ বাসরে নিত্য সত্য কবিতা এবং পুলক। পুলক আসে নিঃশব্দে কবিতার ছন্দে-সুরে। সে প্রচ্ছন্ন থাকে ফুলের সুবাস আর ধূপের গন্ধে। তারই জন্য যে প্রতিটি সন্ধ্যায় দেবিকার বাসর সজ্জা পুলকের আগমনের পথ চেয়ে প্রতিটি বিবিক্ত অপরাহ্নে ওর অভিসার। দেবিকা যে পুলককে কথা দিয়েছে, সে কোনওদিনও ওকে হারিয়ে যেতে দেবে না।

দেবিকা ঘরে ফিরে আসে। মৃদু নীল আলো জ্বলা বাসর ঘর। বিছানায় কাৎ হয়ে একটা বই হাতে তুলে নেয় সে। থাক, বই থাক আজ সন্ধ্যায়। শেখর তখন অমন করে চলে গেল কেন? শেখর, তোমায় আমি ঠকিয়েছি এতদিন। আজ পাঁচ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু কই আমি পেরেছি তোমার সন্তানকে গর্ভে ধরতে? জানি, তোমার মনে চাপা দুঃখ আছে খুব। কিন্তু আমিও কি অসহায় নই? আমিও তো চাই গো তোমার সন্তানের মা হতে। কিন্তু হচ্ছি কই! শেখর, আমি জানি তুমি বলবে আমি দ্বিচারিণী। তোমাকে আঁকড়ে ধরে আমি পুলকের স্পর্শ পেতে চাই। হয়তো তাই সত্য। হয়তো তাই আজও আমাদের সন্তান নেই।

দু হাতে বালিশটা আঁকড়ে দেবিকা চুপচাপ উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। চোখে জলের ধারা বয়ে যায় অবিরাম। কান্না চাপার কথা ওর একবারও মনে হয় না।

এত রাত হয়ে গেছে এরই মধ্যে! সে কি তবে ঘুমিয়ে পড়েছিল! বাইরেটা একেবারে চুপচাপ; কোথাও কোনও সাড়া নেই। শেখর কোথায়? শেখর? সে এখনও আসেনি নাকি? এত রাত তো সে কোনওদিনও করেনি। বাইরে কোথাও গিয়েছে কি! কোথাও হয়ত আটকে গিয়েছে। দেবিকা বিছানা ছেড়ে নেমে আসে। আলো জ্বালিয়ে দেয়। একি! দেওয়াল ঘড়ির কাঁটা একটার ঘর ছাড়িয়ে গিয়েছে। এত রাতেও শেখর আসেনি! অজানা আশঙ্কায় দেবিকার বুক কেঁপে ওঠে।

ভেজানো দরজা খুলে সে বাইরে আসে। প্যাসেজটায় আলো জ্বলছে। সিঁড়ি নির্জন। ধীরে ধীরে দেবিকা নীচে নামতে থাকে। খাবার ঘরেও আলো জ্বালা। টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা দেওয়া। ওদের খাবার। এক সঙ্গে রোজ রাত্রে ওরা খায়। আজ শেখর আসেনি এখনও। রান্না ঘরের দরজায় চাদর জড়িয়ে কাজের লোকটি ঘুমোচ্ছে। দেবিকা তাকে ডাকে না। বাইরের দিক থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ আসছে, কেমন যেন জড়ানো প্রলাপের মতো। দেবিকা কান পেতে শোনে। খরের গলা মনে হচ্ছে। ও এমন বিশ্রীভাবে আওয়াজ করছে কেন? বাইরের ঘরের দিকে এগোতে যায় সে।

সামনে শেখরের মা। ওঁর দু চোখে আগুন। সেদিকে তাকিয়ে দেবিকা চোখ নামিয়ে নেয়। 'মাজী, কে এমন আওয়াজ করছে?'

শেখরের মার চোয়াল দুটো শক্ত হয়। রুক্ষ কঠিন মুখের চেহারা। গলার স্বরও। কে আবার! শেখর।'

'কী হয়েছে ওর মাজী?' ভয় পাওয়া দেবিকার চোখ।

শেখরের মা কয়েক মুহূর্ত দেবিকার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কী বোঝেন উনি। কিন্তু ওঁর চোখের জ্বালা কমে যাচ্ছে। পরিবর্তে ক্লান্তি আর দুঃশ্চিন্তার ছায়া পোড় খাওয়া মুখে স্পষ্ট।

'কিছু হয়নি ওর। মদ গিলছে বসে বসে। কোনও দিন যা করেনি, আজ তাই করছে।'

মদ খাচ্ছে শেখর! মদ! আচম্বিতে কেউ যেন দেবিকার গালে প্রচণ্ড একটা চড় মারে। 'আপনার ছেলে মদ খাচ্ছে কেন, মাজী?'

শেখরের মা অবিশ্বাসী চোখে কিছুক্ষণ দেবিকার দিকে তাকিয়ে থাকেন। 'কী জানি মা। আজ সন্ধে থেকেই কেমন মনমরা হয়ে ছিল বাবুয়া। হঠাৎ বাইরে গেল। আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরে ওপরে গেল। তোমাদের মধ্যে তখন কী হয়েছে তোমরাই জানো। নেমে এসে আবার বাইরে গেল। ফিরে এসে মদের বোতল নিয়ে বসেছে বসবার ঘরে।'

'ও ওপরে এসেছিল? কই আমি তো কিছু, জানিনা মাজী।'

'সেকি!' শেখরের মা বিস্মিত হন। 'তুমি তখন ওপরে ছিলে না? কোথায় ছিলে তা হলে?'

'আমি!' দেবিকা ভাবতে থাকে। হ্যাঁ, ওই সময় সে পুলকের সঙ্গে অভিসারের জগতে বাস করছিল। এই সময়টাতে শেখরের আসার কথা নয়। কোনওদিন সে আসে না। তখন তো স্বপ্নের আঙিনায় নিঃশব্দ চরণে পুলকের আসার সময়। শেখর যে তখন ব্যস্ত থাকে নানা ব্যবসার হিসাবের জগতে। হিসাব ছেড়ে আজ তবে কেন সে হঠাৎ এসেছিল! 'আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মাজী' দেবিকা কথা আড়াল করতে চায়।

'তা হবে বাছা।' অবিশ্বাসী গলায় শেখরের মা বলেন। 'আজ যে বাবুয়ার কী হয়েছে কে জানে! সরকার বাবু হিসাবের খাতা পত্র নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ও সে সব কিছুই দেখল না। খাতাপত্তর ফিরিয়ে দিল। তারপরই মদ নিয়ে বসেছে। আমি বারণ করতে গিয়েছিলাম। তা আমাকেও ফিরিয়ে দিল।' শেখরের মা সরে যান

পর্দা সরিয়ে দেবিকা ঘরে ঢোকে। বড় সোফাটার ওপর শেখর আধশোয়া। সামনে সেন্টার টেবিলে মদের বোতল। জলের জগ। স্খলিত উচ্চারণে কিছু সে বিড়বিড় করছে। ওর কপালে হাত রাখে দেবিকা।

লাল লাল চোখ দুটো মেলে শেখর তাকিয়ে থাকে দেবিকার দিকে। 'এসেছ? পুলক কোথায়, তোমার পুলক? সে চলে গেছে বুঝি সুন্দরী?'

দেবিকা চমকে ওঠে। পুলকের কথা শেখর জানল কী ভাবে! দীর্ঘ পাঁচ বছর যে পুলককে সে সঙ্গোপনে নিজের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, তাকে আজ তার কোন অসতর্কতায় শেখর দেখে ফেলেছে বুঝতে পারছে না। আজ যে চোরের মতে শেখর অসময়ে তার ঘরে এসেছিল। নিশ্চয় তখন পুলক তার উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা পড়ছিল। একি করলে শেখর! দেবিকার বুকের ভিতরটা হায় হায় করে ওঠে। শেখর কেন আজ দস্যুর মতো হিংস্র আঘাতে ওর এতদিনের গোপন প্রেমের স্বপ্ন-বাসরে হানা দিল! শেখর, তুমি এ কী করলে!

না, এ ভালই হয়েছে। চোখের জলকে আটকাতে আটকাতে দেবিকা ভাবে। খেলাঘরের পুতুল খেলা এক সময় তো শেষ করতেই হয়। জীবনের দাবি যে তাই। পুলক হঠাৎ হারিয়ে গিয়ে যে বিষম বোঝা তার কাঁধে চাপিয়ে গিয়েছিল, তা যে আর সে বইতেও পারছিল না। দেবিকার মনে হয়, হঠাৎ শেখরের কাছে ধরা পড়ে সে যেন অনেক হাল্কা হয়ে গিয়েছে।

'ওঠো এবার। ঘরে চলো।' শেখরের চুলের ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে দেবিকা বলে।

'পুলক! সে কোথায়? ও এখনও আছে?' জড়ানো জিজ্ঞাসা শেখরের।

'পুলক আর কোনওদিনও আসবে না। তুমি দেখে নিও।'

'ওর কবিতা! তোমার কবিতা পাঠ?'

'পুলক হারিয়ে গেছে। ওর সঙ্গে কবিতাও হারিয়ে যাবে এবার। তুমি ওঠো লক্ষ্মীটি।' দেবিকার দু চোখ টলমল করে।

দেবিকাকে ধরে শেখর এবার উঠে দাঁড়ায়। 'সত্যি বলছ তো?'

'সব সত্যি। তুমি ঘরে চলো।'

নিজেদের ঘরে শেখরকে শুইয়ে দিয়ে টিউবের আলোটা জ্বালে দেবিকা। আলোতে চোখে ধাঁধা লাগে। একটা নিষ্ঠুর দৈত্যের মতই আলোটা সাদা সাদা দাঁত বার করে হাসে। দেবিকা একটা বই টেনে নেয়। মলাট ওল্টাতেই পুলকের নাম চোখে পড়ে। কোনও এক বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় সে চুপিচুপি ওকে বইটা দিয়েছিল। পুলকের নিজের হাতে গোটা গোটা করে লেখা 'আমার মিতাকে'। বইটা বন্ধ করে এক মিনিট চোখ বুঁজে থাকে দেবিকা। ফুলদানি থেকে এক গোছা রজনীগন্ধা তুলে নেয়। বইটার ওপর ফুলগুলো রাখে। শেখর নিঃশব্দে ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে। দেবিকা সে দিকে তাকিয়েই নিজের সব দ্বিধা-সংশয়কে ঠেলে ফেলে বাইরের বারান্দায় ছুটে যায়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রেলিঙের ধারে। আকাশের অজস্র তারার মাঝে কী যেন আশ্বাস খোঁজে। উৎফুল্ল পুলকের উদাসী চোখের স্বপ্নকে রেণু রেণু করে ছড়িয়ে দেয় মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে। চোখ বন্ধ করে থাকে প্রাণপনে। 'পুলক, আমায় ক্ষমা করো। আমার কথা আমি রাখতে পারলাম না। তবু তোমার যাবার বেলাটুকু আমার চোখের জলে ভরে উঠুক।'

অবশ হয়ে কতক্ষণ দেবিকা দাঁড়িয়ে কাঁদে ওর খেয়াল ছিল না। আনমনে কখন কোন অসতর্ক ক্ষণে পুলকের দেওয়া কবিতার বইটা ফুলের সঙ্গী হয়ে রাস্তার ধুলোয় গিয়ে পড়েছে। 'পুলক, তুমি আমার চোখে আলোর মুক্তো খুঁজেছিলে। এই দেখো, দু চোখে আমার মুক্ত ধারা।'

কে যেন দেবিকার কাঁধে আলতো হাত রাখে। শেখর। সে কখন উঠে এসেছে। দেবিকা মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখে। তারপর ওর বুকে লুটিয়ে পড়ে। 'শেখর, পুলক আর আসবে না। ও চলে গেল চিরদিনের জন্য।'

নিবিড় আলিঙ্গনে শেখর দেবিকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

সাঁকোর ওপারে

ত্রিবেণী ঘাট রোড দিয়ে অনীশ এগিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তাটা গঙ্গামুখী হলেও নদী ওর গন্তব্য নয়। ও একটা ফিল্মের দোকান খুঁজছিল। ক্যামেরাতে একটা রীল ভরতে হবে। হোটেল নীলকণ্ঠের পাশ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে পোস্ট অফিসটা বাঁয়ে ফেলে সামান্য যেতেই একটা ফিল্মের দোকান পাওয়া গেল। সাজানো দোকান। একটা কোডাক বা ফুজিকালার থার্টিসিক্স এক্সপোজারের রোল তার দরকার।

ফিল্ম আছে কি না জিজ্ঞাসা করে অনীশ। দোকানী কথা বলছিল ঈষৎ স্থূলাঙ্গী এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে। অনীশের গলা শুনে মহিলাটি সামান্য ঘাড় ঘোরালেন। এককালে দারুণ সুন্দরী ছিলেন বেশ বোঝা যায়। এখনও, মধ্য বয়সের প্রান্ত সীমায় পৌঁছলেও, ওর চামড়ার রং, চশমার আড়ালে থাকা উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি, মুখের কাটিং এবং অবয়বের গাম্ভীর্য অনীশকে একটি বার্তা জানাল। ভদ্রমহিলা যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত এবং স্বচ্ছল পরিবারের বধূ-কাম-গৃহিনী। ওঁর দেহরেখা থেকে কথা বলার ভঙ্গিতে পর্যন্ত ফুটে উঠেছে ওঁর স্বাতন্ত্রের পরিচয়। এ সব সত্ত্বেও অনীশের মনে হল ভদ্রমহিলা তার বহুদিনের চেনা। শুধু তাই নয়, অনেক দিনের আত্মীয়তার সম্পর্ক ওঁর সঙ্গে। কোথায় এঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে তৎক্ষণাৎ মনে করতে পারে না। স্মৃতির ধূসর হয়ে আসা পৃষ্ঠাগুলো সে হাতড়াতে থাকে।

প্রিন্ট করতে দেওয়া ছবির ডেলিভারি নেওয়া হয়ে গিয়েছিল ভদ্রমহিলার। দাম মিটিয়ে তিনি বেরিয়ে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়ান। একেবারে সামনাসামনি অনীশের দৃষ্টি পড়ে তাঁর ওপর। এ তো খুব চেনা কেউ—কিন্তু কে? হঠাৎ অতীতের দুয়ার ঠেলে একটি নাম অনীশের মনে আসে—অরুন্ধতী। একি সেই মেয়ে যার আসল নাম নিয়ে কোনওদিন সে মাথা ঘামায়নি? মনেও রাখেনি সে নাম। সেই মেয়ের নাম সে নিজেই দিয়েছিল বশিষ্ঠের ভার্যার নামানুসারে। অবশ্যই মনে মনে। অন্য নামও নিশ্চয় দেওয়া যেত। কিন্তু অনীশ দেয়নি। কারণ একটাই। এই মেয়ের সঙ্গে যে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী ও অনীশের ভীষণ পছন্দের নায়িকা অরুন্ধতী দেবীর খুব সাদৃশ্য ছিল। অন্তত অনীশের তাই মনে হত। শুধু চেহারাতে নয়, কণ্ঠস্বর এবং বাচনভঙ্গিতেও। সেজন্যই আরও সেই মেয়ের দ্বিতীয় কোনও নাম অনীশের মনে আসেনি।

কিন্তু সে মেয়ে এখানে আসবে কী করে! তার তো খোঁজই অনীশ জানে না। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই প্রৌঢ়া মহিলাটিই একদিন তার প্রথম জীবনের ভাললাগার সেই দুরন্ত আকর্ষণ ছিল। অনেকগুলো বছর গড়িয়ে যাবার পর আজ তার সামনে হঠাৎই আবার নতুন করে দেখা দিয়েছে। ভাবনার চোরাগলিতে হোঁচট খেতে থাকে অনীশ।

এতক্ষণে মহিলাটির দৃষ্টিও বন্দি হয়ে গেছে অনীশের চোখের তারায়। ওঁর মুখের ভঙ্গিতে হেলদোল হয়। কণ্ঠস্বরেও পরিবর্তন বোঝে অনীশ। ওর দিকে তাকিয়ে মহিলাটি বলে ওঠেন, এক্সকিউজ মি, আপনি বাঙালি মনে হচ্ছে।

অরুন্ধতী কি তাহলে ওকে চিনতে পেরেছে? বহু বছরের ওপার থেকেও? সচকিত অনীশ উত্তর দেয়, হ্যাঁ। সে শুধু বাঙালি নয়, উত্তর কলকাতার এক এঁদো গলির বাঙালি।

অনীশের কথায় মহিলাটি হেসে ফেলেন। —চিনেছ তাহলে?

একেবারে সেই কণ্ঠস্বর, উচ্চারণের ধরনও এক। অনীশের বুকের মধ্যে ছলাৎ করে ওঠে। সেও হাসে।—তুমিও তো চিনেছ।

—কত বছর পরে আমাদের দেখা! ভাবা যায় না। অবশ্য তোমায় চেনা কঠিন—কী চেহারা বানিয়ে রেখেছ? একেবারে বুড়োর মতো।

অনীশ মনে মনে হিসাব করে। তখন সে সবে এম. এ পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছে। জেলায় পোস্টিং হয়ে গেছে। তার মানে কলকাতা থেকে বিদায়। বিদায় অরুন্ধতীর কাছ থেকেও। চাকরি তখন তার একমাত্র আকর্ষণ। চাকরির সিঁড়ি ভেঙ্গে দ্রুত সে ওপরে উঠতে চাইছিল। তাই আরও পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু। সেটা ছিল নাইনটিন সিক্সটিফোর। এটা নাইনটিন নাইটিনাইন। ও কত দিন হয়ে গেছে। অরুন্ধতীও মনে মনে হিসাব করে। —প্রায় পঁয়ত্রিশটা বছর কেটে গেছে এরই মধ্যে? ওর দৃষ্টি উদাস হয়ে যায়

দার্শনিকের মতো মুখ করে অনীশ একটু হাসে।—দিন এমন যায়—বড্ড তাড়াতাড়ি। বোঝা যায় না। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার হয় বয়স অনেক বেড়ে গেছে। শেষের সে দিন কাছে চলে এসেছে।

—এই ফটোর দোকানে দাঁড়িয়েই কথা বলবে?

—না, চলো যাওয়া যাক। অনীশ দরজার দিকে এগোতে থাকে।

—ঋষীকেশে কবে এলে? কোথায় উঠেছ?

—গতকাল দুপুরেই এসেছি। অনীশরা রাস্তায় নামে।

—কোথায় উঠেছ বললে না? অরুন্ধতী চোখ নাচায়।

—বলার মতো কোনও জায়গা নয়—কালীকমলির ধর্মশালা। এখান থেকে খুব কাছে।

—এ: ধর্মশালায় উঠেছ? ঠোঁট ওল্টায় অরুন্ধতী।—খুব নোংরা নয়? ওখানে আছ কী করে?

—নোংরা কেন হবে? বরং বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। লোকজন তো এই সময়টায় কম আসে খুব। তিনতলায় বাড়িটার পেছন দিকে একটা ভাল ঘরও পছন্দ করে নিয়েছি। জানালা খুললেই ওই সামনের পাহাড়টা দেখা যায়। বিরাট পাহাড়। আমি ওর নাম দিয়েছি নীলকণ্ঠ। আসল নাম জানি না। আমি আমার মতো নাম দিয়েছি। অনীশ হাসে।

অরুন্ধতীও হাসল।—তাহলে তো ভাল ঘরই পেয়েছ! গঙ্গা কাছে, আবার পাহাড়ও চোখের সামনে।

—তুমি, তোমরা কোথায় উঠেছ? হোটেলে?

—হ্যাঁ, হোটেল ইন্দ্রলোকে। সে-ও এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ব্যবস্থা-ট্যবস্থা মোটামুটি ভাল।

দুজনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। অরুন্ধতী প্রসঙ্গ পাল্টায়।—এখন কোথায় যাবে?

—ধর্মশালাতেই ফিরে যাব ভাবছি। ওখানে আমার বউ আছে, ছেলে-মেয়েও আছে। তবে তুমি চাইলে আমরা গঙ্গার দিকে এগোতে পারি।

অরুন্ধতী সম্মতি জানায়। দুপুর আর বিকেলের সন্ধিক্ষণের রোদ গায়ে মাখিয়ে কথা বলতে বলতে দুজনে নদীর দিকে হাঁটতে থাকে।

—তোমরা হৃষীকেশে কবে এসেছ? সঙ্গে কে কে আছে? তোমার স্বামী এসেছেন তো?

অরুন্ধতী কী ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল। অনীশের প্রশ্নে মুখ তুলল। —কী রকম যোগাযোগ দেখ! পরশু এসেছি আমরা কিন্তু আজ সকালেই আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা ছিল। গেলে তোমার সঙ্গে এই হঠাৎ দেখাটা হত না।

—যাওয়া হল না কেন?

—একটা টেলিফোনের জন্য আটকে গেছি। ফোন অবশ্য হয়ে গেছে।

—তোমরা কে কে এসেছ বললে না?

—স্বামী আর ছেলে সঙ্গে আছে। ছেলের জন্যই আসলে আমরা এসেছি। ও ডুন স্কুলে পড়ে।

—ডুন স্কুলে পড়ে তোমার ছেলে? খুব ভাল। কত বয়স ওর?

অরুন্ধতী হাসে। —আমার ছেলে ছোট। ওই একটিই ছেলে। আগেরটি মেয়ে। বুড়ো বয়সের সন্তান বলতে পার। ছেলের স্কুলে হঠাৎ কদিন ছুটি পড়েছে। তাই আমরা এসেছি। এই সুযোগে ওকে নিয়ে গাড়োয়ালের পাহাড়ে ঘুরব।

—সে খুব ভাল করেছ। রথ দেখা এবং কলা বেচা এক যাত্রায় হবে। মেয়ে আসেনি?

—না, সে তার লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত। অরুন্ধতী হাসল।

গঙ্গার ঘাট কাছে এসে গিয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে অরুন্ধতী বিষণ্ণ বোধ করে। —তুমি এখন কী করছ, অনীশ? রিটায়ার করে গেছ কি? কোথায় আজকাল থাক? ক'লকাতায়? সেই বাড়িতেই?

অনীশ! অরুন্ধতীর মুখে নামটা শুনে অনীশ চমকিত হয়। অরুন্ধতী ওর নাম জানে। শুধু জানে না, এখনও সে নাম মনে রেখেছে! অথচ অরুন্ধতীর আসল নাম অনীশ জানে না। কোনওদিন শুনে থাকলেও এখন আর মনে নেই। মনে রাখার তাগিদও ছিল না কিছু। থাকবে কেন? অরুন্ধতীই তো একটা স্বপ্নের নাম। অন্য নামের প্রয়োজন কী!

অনীশকে নিরুত্তর দেখে অরুন্ধতী তাগিদ দেয়। কী হল? বললে না তুমি এখন কলকাতায় থাক কি না।

অনীশ মুখে হাসি আনে। —হ্যাঁ, কলকাতাই বলা যায় এক রকম। এই বছরে রিটায়ার করলেও চাকরিতে বহাল আছি এখনও। মন্ত্রীর নেকনজরে আছি কিনা। তাই আমার অফিসও কলকাতাতেই। তবে খাস কলকাতায় থাকি না আজকাল। বিরাটি স্টেশনের কাছে কিছুদিন হল বাড়ি করেছি—পোস্টাল জোন কিন্তু কলকাতার। সেখানে ফাঁকি নেই।

অনীশের বলার ধরনে অরুন্ধতী হেসে ফেলে। আগের মতোই ওর হাসিটা। —তোমাদের সেই বাড়িটার কী হল? বিক্রি করে দিয়েছ নাকি?

—না না, সে বাড়ি আছে। বিক্রি করব কী? ওটাতো ভাড়া বাড়ি। দু ভাই সপরিবারে ওই বাড়িতে এখন থাকে। বাকিরা আলাদা থাকি। আসলে সকলের আর একত্র জায়গা হয় না। সবারই সংসার বেড়ে গেছে। আমাদের ভাড়া বাড়িটাও ছোট, বহু পুরনো।

গঙ্গা এসে গিয়েছিল কথার ফাঁকে। ঘাটের বিশাল বাঁধানো চত্বরে নামতে নামতে অনীশ বলল, চলো, নদীর একেবারে ধারে ওপাশটায় গিয়ে বসি। ওদিকটা খুব নিরিবিলি থাকে। অবশ্য হৃষীকেশে এখনও মরসুমী ভিড় শুরু হয়নি। কেদার-বদ্রীর রাস্তা একবার খুলে যাক —তারপর দেখো।

সামনেই গঙ্গা স্রোতস্বিনী। নদীখাত যথেষ্ট চওড়া হলেও ঘাটের দিকে জল বেশি।

ছোট-বড় পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে নদী শুধু বেগবতীই নয়, খানিকটা সগর্জনা। মার্চ শেষের মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ওপাশের নুড়ি-বালি-পাথরের শ্বেত-রেখা শেষে গাছগাছালির এলোমেলো জটলা। বাঁ দিকে, নদী যে দিক থেকে বয়ে আসছে, গম্ভীর সুউচ্চ পাহাড় দাঁড়িয়ে। অনীশ এরই নাম দিয়েছে নীলকণ্ঠ।

—তারপর? কথাটা বলে অনীশ হেসে ফেলে। —তোমার সঙ্গে এতগুলো বছর পরে এমন ভাবে আবার আমার দেখা হবে, আমি কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।

—আমি কিন্তু জানতাম আমাদের দেখা হবেই। অরুন্ধতীর গ্রীবায় আত্মবিশ্বাসের ব্যঞ্জনা।

—সত্যি তুমি জানতে?

—হ্যাঁ, জানতাম তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে—কোনওদিন না কোনওদিন দেখা হবেই। হতেই হবে।

অনীশের চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে— তোমার এত বিশ্বাস ছিল?

—ছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। আর তখন আমি তোমার কাছে কৈফিয়ত চাইব।

—কৈফিয়ত চাইবে? কিসের কৈফিয়ত? অনীশের চোখে কৌতুক নেচে ওঠে।

—কিসের কৈফিয়ত শুনবে? অরুন্ধতীর চশমার নীচে চাপা বিদ্যুৎ। —মনে আছে নিশ্চয়, আমায় তুমি একদিন বিশ্রী ভাবে অপমান করেছিলে। কেন করেছিলে সেই কৈফিয়ত চাই আজ।

আকাশ থেকে পড়ে অনীশ। —তোমায় অপমান করেছিলাম! কবে? তোমার সঙ্গে তো আমার কোনওদিন কথাটথাও বিশেষ হয়নি। তবে অপমান করলাম কী ভাবে?

—অপমান করনি? তোমার মনে নেই তুমি আমাকে একদিন ছাদে এসে চড় দেখিয়েছিলে? কেন দেখিয়েছিলে? তোমার এত সাহস একটি মেয়েকে চড় তুলে দেখাও। বলো, কেন আমায় সেদিন হাত তুলে বারবার চড় দেখাচ্ছিলে?

সেদিনের সেই অপমানের জ্বালায় এতদিন পরেও অরুন্ধতী থমথম করে ওঠে।

—তুমি কী সব বলছ? বিশ্বাস করো, আমার কিছুই মনে নেই। তা ছাড়া চড় তো মেয়েরাই দেখায়। উল্টোটা তো হয় না। বোকা বোকা মুখে অনীশ হাসে।

—তোমার তো মনে থাকবে না কারণ অপমানিত তুমি হওনি। অরুন্ধতীর ফর্সা মুখে কুয়াশা ঘন হয়ে ওঠে। —উল্টে একটি মেয়ের প্রথম ভাললাগাকে অবলীলায় অপমান করতে পেরেছিলে তুমি। সেই অপমানের জ্বালা আজও ভুলতে পারিনি আমি। যতদিন বেঁচে থাকব, হয়তো ভুলতেও পারব না। কেন জানো? জীবনের প্রথম ভাললাগার মানুষের কাছ থেকে অপমানের আঘাতটা বড্ড বেশি আমার বুকে বেজেছিল। আজ পর্যন্ত আর কেউ আমাকে এমন দুঃসহ অপমান করতে সাহস পায়নি।

আচম্বিতে পুরো ঘটনাটা অনীশের মনে পড়ে যায়। এম এ পরীক্ষা একেবারে সামনে এসে গেছে অথচ তখনও ওর প্রস্তুতি প্রায় প্রাথমিক স্তরে। এই অবস্থায় এক বিকালে ও ওদের তিনতলার কুঠুরি ঘরের জানালায় ঠেসান দিয়ে এক মনে পড়ছিল। কিছুটা দূরে, অর্থাৎ দুটো বাড়ি পরে উল্টো দিকে অরুন্ধতীদের ছাদ। ছাদের রেলিঙে বুকের ভর রেখে অরুন্ধতী দাঁড়িয়েছিল। পরনে লাল হলুদে ছাপা শাড়ি। অনীশ ওকে কোনও পাত্তা না দিয়ে

পড়েই যাচ্ছিল। কিন্তু বাধা আসছিল বারবার। অরুন্ধতী নানা ভাবে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিল।

অনীশদের পরের বাড়িটা গোবনদের। ছাদে গোবনের কোনও বোনকে পেয়ে আলতু ফালতু আলাপ করছিল অরুন্ধতী। অকারণে জোরে জোরে হেসে উঠছিল মাঝে মাঝেই। অনীশ বুঝেছিল গায়ে পড়া আলাপ করছে মেয়েটা একটা উদ্দেশ্যেই। ওকে পড়তে দেবে না কিছুতেই। সে জানালাটা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু বন্ধ জানলার ওপার থেকে অরুন্ধতীর অনর্গল কথা ও হাসি সে শুনতে পাচ্ছিল। তা ছাড়া জানালাটা বন্ধ করায় গুমোট গরমে ঘরে থাকা কষ্টকরও হচ্ছিল। এ ঘরে কোনও ফ্যান ছিল না। বাধ্য হয়ে অনীশ আবার জানালাটা খুলে দেয়। কিন্তু শান্তি নেই। অরুন্ধতীর জোরে জোরে আলাপ করে যাওয়ার শেষ নেই। অকারণ হাসিরও।

রাগে জ্বলতে জ্বলতে অনীশ নিজেদের ছাদে-এসে দাঁড়ায়। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে উচ্ছল সুন্দরী মেয়েটির দিকে। গোবনের বোন অনীশকে দেখে কী বুঝল সেই জানে। সে আর দাঁড়াল না। এটা ওটা কথার পর সরে গেল। অরুন্ধতীও চুপ। নিশ্চিন্ত অনীশ আবার পড়া নিয়ে বসে।

কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই ওকে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না। এবার আর গোবনের বোন নয়, গোবনকে ডেকে হিন্দি কোন ছবি নিয়ে সরবে আলোচনা শুরু করেছে। বৃথাই অনীশ পড়ার চেষ্টা করল। অরুন্ধতীর তীক্ষ্ণহাসি এবং শ্লেষাত্মক কথাবার্তা ওর সব চেষ্টা বানচাল করে দেয়। গোবনের মতো একটা মাস্তান গোছের ছেলের সঙ্গে অরুন্ধতীর চটুল আলাপ হঠাৎই অরুন্ধতী সম্বন্ধে অনীশের প্রত্যাশাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। তার প্রতি সে এক ধরনের বিদ্বেষ অনুভব করে। ইস এত নিচু স্তরের রুচি মেয়েটার। ক্রুদ্ধ অনীশ ছাদে চলে আসে।

অনীশকে ছাদে দেখে অরুন্ধতীর উৎসাহ যেন বেড়ে গেল। ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে গোবনের সঙ্গে নতুন রিলিজ হওয়া একটা হিন্দি সিনেমা দেখার প্ল্যান করতে থাকে। সেখানেই কি শেষ? বজ্জাত মেয়েটা গোবনের সঙ্গে কথা বলছে আর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বিচিত্র ভাবে হাসছে। সে হাসিতে তাচ্ছিল্য আর বিদ্রূপ ছাড়া সেদিন অনীশ অন্য কিছু পায়নি।

এবার আর সহ্য হল না। কোনও কিছু ভাবার আগেই অনীশ তার ডান হাতটি শূন্যে তুলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চড় দেখায়। একবার-দুবার-তিনবার। অরুন্ধতীর প্রতিক্রিয়া বোঝার আগেই সে ঘরে ফিরে আসে। সশব্দে জানালা বন্ধ করে নেমে যায়। আজ আর পড়া হবে না।

হৃষীকেশের এই পড়ন্ত বিকেলে অনীশের সব কথা মনে পড়তে থাকে। সেদিন একটা বেয়াদপ মেয়েকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে বলে তার মনে কোনও অনুতাপ ছিল না। এম এ পরীক্ষা এবং তারপর চাকরি জোটানর কঠিন লড়াই-এ এ ঘটনা কবে নিঃশব্দে হারিয়ে গিয়েছিল।

আজ এই মুহূর্তে অনীশের অবশ্য বেশ লজ্জা করতে লাগল। এই সেই মেয়ে যাকে সে নিতান্ত বাচাল ভেবে বারবার চড় দেখাবার ভঙ্গি করেছিল। কিন্তু সেই ঘটনা এবং সেই প্রগল্ভ মেয়েটি সত্যি সত্যিই তার স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়নি। নিজের প্রতি ধিক্কারে

অনীশ অরুন্ধতীর দিকে চাইতে পারে না। সে মুখ নিচু করেই থাকে।

নদীর অবিরাম ঢেউ ভাঙ্গার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পর অরুন্ধতীই কথা বলে—তুমি খুব বোকা, অনীশ। সেই সঙ্গে জেলাসও। তোমার যদি চোখ থাকত, তাহলে সেদিনই তুমি আমাকে বুঝতে চাইতে। তা চাইলে তোমার স্বাভাবিক বিচারেই বুঝতে পারতে গোবনের মতো কোনও ছেলেকে ঈর্ষা করার মতো তোমার কোনও কারণ ছিল না। সেদিন আমি তোমাকে ছাদে টেনে আনতে চাইছিলাম শুধু। এ জন্য আমি বাচালতাও করেছি ঠিক। কিন্তু সেদিনের সেই বিকেলের আলোতে ভাললাগার চোখ নিয়ে কেবলই তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। অন্য ভাবে দেখাদেখির সুযোগ তখন আমাদের কোথায় ছিল বলো? কিন্তু তুমি আমার ইচ্ছে পূরণ করনি। উল্টে চড় তুলে আমার চাওয়াকে অপমান করেছিলে। আমি নিশ্চয় সেই অপমান ভুলে যেতাম, যদি বুঝতাম তুমি লজ্জা পেয়েছ এবং পরবর্তী সময়ে আমাকে নিজের কাছে টানতে চাইছ।

একটু থামে অরুন্ধতী। এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে সে যেন হাল্কা বোধ করে। কিন্তু ওর কথা শেষ হয়নি। শক্ত কথাগুলো বলতে ও দ্বিধা করে না একটুও। —না, অনীশ, লজ্জা তুমি পাওনি। আমাকে তোমার কাছে টেনে নেবার চেষ্টাও কিছু করনি। তুমি তখন ক্যারিয়ার-সচেতন স্বার্থপর পুরুষ। তুমি যদি—!

—থাক থাক, আর বোলো না প্লিজ। অনীশ হাত তুলে বাধা দেয়। অধোবদনে থেকেই সে বলে যায়, —সেদিন আমার ব্যবহারে আমি লজ্জা পাইনি ঠিকই। পরীক্ষা পাশ, ভাল চাকরি এ সবই আমার লক্ষ্য হয়েছিল। কিন্তু সেদিনকার সেই লজ্জা হাজার গুণ বড় হয়ে আজ আমায় বাজছে। তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার আমার কোনও মুখ নেই।

অরুন্ধতী চোখ তুলে অনীশকে নিরীক্ষণ করে। বুঝতে চাইল হয়তো সে আজ সত্যিই লজ্জিত কি না। —আমি কিন্তু শুধু অপমানের কথাই মনে রাখিনি, অনীশ। তোমাকে ঘিরে এককালে গড়া আমার টুকরো টুকরো স্বপ্নের আরও অনেক কিছুই মনে রেখেছি।

—আমাকে নিয়ে স্বপ্ন! স্বার্থপর ও বোকা জেনেও? নিজেকে গুটিয়ে নিতে নিতে অনীশ উত্তর দেয়।

অরুন্ধতীর হাসিতে শব্দ উঠল। —না না অনীশ, অত সঙ্কুচিত হয়ো না। চড় দেখানোর বাইরেও তোমাকে নিয়ে আমার অনেক মধুর স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। তোমাকে প্রথম দেখার অভিজ্ঞতার কথাই ধরো। তুমি যাচ্ছিলে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে গোবনের মেজ বোন আনুর সঙ্গে গল্প করছিলাম। তুমি চলে যেতেই আনু আমায় বলল, এ ছেলেটা এবার আই এস সিতে স্কলারশিপ পেয়েছে। এ তল্লাটে ও একলাই এত ভাল রেজাল্ট করেছে। স্কুল ফাইনালেও স্কলারশিপ পেয়েছিল। আমি তোমার চলে যাওয়া মূর্তিটাকে দেখলাম—বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হল। সেই শুরু। তোমায় ভাল লাগতে লাগল। এক পলকেই তুমি একটা কিশোরী মনের নায়ক হয়ে গেলে।

—তাই নাকি? অনীশ মুখ তোলে। —এ তো আমি জানতাম না।

—তুমি কোনওদিন জানতে চাওনি, অনীশ। তাই ঘটনাটা তোমার কাছে রহস্যই থেকে গেছে। তুমি পড়াশোনায় কৃতী ছিলে, তোমার চেহারা সুন্দর, ভাল আবৃত্তি করতেও পারতে। তাই-ই দেমাকে তোমার মাটিতে পা পড়ত না। আমার মতো সাধারণ একটা মেয়ের দিকে চোখ তুলে চাইবার সময় তোমার কোথায় ছিল?

—কথাটা তুমি কি ঠিক বললে? অনীশ আত্মরক্ষায় যায়। —তুমি ছিলে আমাদের কাছে সেরা সুন্দরী। তারপর আবার বড়লোকের অহঙ্কারী মেয়ে। রবীন্দ্র সংগীত গাইতে ভাল। হোলি চাইল্ড না কোন একটা নামী স্কুল হয়ে সবে বেথুনে ভর্তি হয়েছ শুনেছিলাম। তোমার দিকে চোখ তুলে চাইবার সাহস আমার মতো অতি সাধারণ একটি পরিবারের ছেলের আসবে কোথা থেকে বলো?

—একদম বাজে কথা বলছ। অনীশ, তোমার হয়তো মনে নেই, আমার স্পষ্ট মনে আছে, পাড়ার রবীন্দ্র জয়ন্তীতে তুমি আবৃত্তি করেছিলে। আমি গান গেয়েছিলাম। গ্রুপ-এও নেচে ছিলাম চিত্রাঙ্গদায়। আমার গান শুনে তোমার চোখের ভাষায় প্রশংসা ছিল না এতটুকু। বরং অবজ্ঞা ছিল এলেবেলে গাইয়েদের গান শুনে যেমন হয় আর কী।

—তোমার এত সব মনে আছে, অরু? আমার তো কিছুই মনে নেই।

—কী, কী নাম বললে? কী নামে ডাকলে আমায়?

—কেন, অরু, অরুন্ধতী।

—আমার নামটাও তোমার মনে নেই? অরুন্ধতীর চোখ দুটো ভারী হয়ে উঠল।

—অনামিকা না আলপনা জাতীয় তোমার কী একটা নাম আমি শুনেছিলাম নিশ্চয়। আমার কাছে সে নামের কোনও মূল্য ছিল না। মোহ তো নয়ই। তাই সে নাম আমি মনে রাখিনি কোনওদিন। আমার যৌবন শুরুর সেই দিনগুলোয় আমার প্রিয় নায়িকা ছিল অরুন্ধতী দেবী —সেই সময়কার বিখ্যাত চলচ্চিত্র নায়িকা। ওঁকে আমার ভীষণ ভাল লাগত। ফিল্মের সেই অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে তোমার অনেক মিল আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। চেহারার মিল তো ছিলই, তোমার কণ্ঠস্বর, কথা বলার ভঙ্গি, এমনকী গান গাইবার স্টাইলটিও সবই ছিল প্রায় তাঁর মতো। তাই তোমার নাম আমি দিয়েছিলাম আমার স্বপ্নের নায়িকার নামে। সে নামেই তোমায় আমি চিনতাম, ভাবতাম এবং সেই নামেই তুমি আমার বুকের একেবারে কাছটিতে চলে এসেছিলে।

উদাস হয়ে পড়া অনীশের চোখে প্রথম যৌবনের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো হঠাৎ আবার ফিরে আসে।

অরুন্ধতীর মুখের মেঘ কেটে যায়। —আমি জানতাম অনীশ, তুমি আমায় এই নাম দিয়েছিলে।

—তুমি জানতে? কী করে? তোমার সঙ্গে তো আমার সামনাসামনি কথা হয়নি কোনওদিনও। কথা হবার উপায়ও অবশ্য বিশেষ ছিল না।

—আমি একদিন গলির ওপর দরজাটা খুলে দাঁড়িয়েছিলাম। আনু আমার জন্য একটা বই আনতে গিয়েছিল। তোমার দুই প্রিয় বন্ধু, কী তাদের নাম আজ আর মনে নেই, সে সময় সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। ওদের একজন আমায় শুনিয়ে বলে ওঠে, ওই দেখ অরুন্ধতী দাঁড়িয়ে। কথাটা কানে যেতে আমি চমকে গিয়েছিলাম। মনের মধ্যে হঠাৎ খুব আনন্দ হল। বুঝতে পারলাম আমার এই নামকরণের পেছনে সবটাই তোমার হাত। তা ছাড়া আনু পরে তোমার বউদির কাছেও শুনেছিল আমার এই নামের কথা। বউদিকে কোনও সময় তুমি নিশ্চয় বলেছিলে।

—নামটা তোমার ভাল লাগেনি? অনীশ প্রশ্ন করে।

—এ প্রশ্নের একটাই উত্তর। আমি সে সময় সত্যি সত্যিই নিজেকে অরুন্ধতী নামের

একটি মেয়ে বলে ভাবতাম।

হঠাৎ অনীশ ছোট একটি ছেলের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।—আচ্ছা অরু, তোমার সেদিনকার কথা মনে আছে, যেদিন বেলা দুপুরে হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে গেল?

—আকাশ এমনি কালো তো কতদিন হয়েছে। তুমি তখন হয়তো কলেজে, না হলে অন্য কোথাও।

—না অরু, এমন দিন আমাদের জীবনে মাত্র একটিই এসেছিল। আকাশে মেঘ জমতেই তুমি তোমাদের ছাদে চলে এলে। আমি পড়ছিলাম তিনতলার কুঠুরিতে বসে। ঘন মেঘের কালো ক্যানভাসে তোমার চুল উড়ছিল। তোমায় দেখে মনে হল জলপরী মেঘের থেকে নেমে এসেছে। নীল জমিতে লাল বুটিদার একটা শাড়ি পরেছিলে তুমি। আমার এত ভাল লাগল তোমাকে যে পড়া ফেলে, ঘর ছেড়ে, ছাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। মনে আছে আমরা দুজনেই দুজনকে বারবার দেখলাম। তোমার মুখে হাসি ছিল। তাই দেখে উৎসাহে আমি হেঁড়ে গলায় আবৃত্তি শুরু করেছিলাম।—দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পর দেহ ঘেরি মেঘ নীল বেশ। আমার গলা তোমার কানে পৌঁছেছিল কি না জানি না, কিন্তু তুমি গান ধরলে মন মোর মেঘের সঙ্গী। সে দিনের কথা তোমার মনে আছে, অরু?

—মনে আছে গো, মনে আছে, সব মনে আছে। জীবনের সবচেয়ে রোমান্টিক সেই দিনটিকে কি ভোলা যায়? আমাদের সেই সময়টাতে ছেলে-মেয়েরা আজকের মতো এত সহজে আলাপ করতে বা মেলামেশা করতে তো পারত না। তাই ভাললাগা-ভালবাসা এ সব ছিল নিষিদ্ধ বস্তু। কিন্তু সেই দুপুরে, দু বাড়ির লোকই যখন ঘুমে ঢুলে আছে, আমরা গাঢ় মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মন দেওয়া-নেওয়া করেছিলাম। যখন বৃষ্টি নামল অঝোর ধারে, তখনও আমরা ছাদে দাঁড়িয়ে। দুজনেই কষে ভিজলাম। যতক্ষণ বৃষ্টি হল ততক্ষণই ভিজলাম। বাদলা হাওয়াতে শীত করছিল খুব। তবু ছাদ থেকে সরে যেতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। আমরা যে দুজনে দুজনের কাছাকাছি একই আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে। এত কাছে আর কখনও আসিনি আমরা। শেষকালে আমার মা যখন ওপরে উঠে এসে আমায় ডাকল, তখন চলে যাওয়া ছাড়া আমার আর উপায় ছিল না।

—অরু, তোমার মা আমাদের দুজনকেই দেখেছিলেন। তিনি অনেক কিছুই বুঝে যান সে মুহূর্তেই! তাই তারপর থেকে একলা ছাদে আসা তোমার বন্ধ হল। সব সময় নজরদারির আওতায় তুমি পড়ে গেলে।

—ঠিক বলেছ, অনীশ। আর কী হয়েছিল সে সময়, তোমার মনে আছে কিছু?

—সব কথাই মনে আছে, অরু। সেদিনের অত ভেজার ফলে ধুম জ্বরে তুমি পড়লে। আর একটু হলেই নিউমোনিয়া হয়ে যেত। আমার বউদি একদিন বলেছিল, জ্বরের ঘোরে তুমি নাকি আমার নামও করেছিলে।

সন্ধ্যা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছিল। হৃষীকেশের গঙ্গায় ছড়িয়ে থাকা বিকেলের আলো নীলকণ্ঠ পাহাড়ের চুড়ো ছুঁয়ে এতক্ষণে ওপারের গাছগাছালির মাথায় মাথায় কালচে-ধূসর রং নিতে শুরু করেছে। হাওয়াতে শিরশিরানির একটা নরম ছোঁয়া টের পাচ্ছিল অনীশ। সে গভীর দৃষ্টি তুলে অরুন্ধতীকে বলে, অরু, আঁচলটা গলায় ভাল করে জড়িয়ে নাও। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। তোমার তো আবার সারা জীবন টনসিলের ধাত।

আঁচলটা টেনে গলায় জড়াতে জড়াতে অরুন্ধতী অনীশের দিকে প্রেমময় দৃষ্টি মেলে

ধরল। —তোমার এ কথাটাও মনে আছে?

হাসল অনীশ। —অনেক কিছুই মনে আছে। এখন তো আরও বেশি করে মনে পড়ছে সে সব কথা।

বিকেলের আলো ফুরিয়ে যায় এক সময়। হালকা আঁধারে দু-চার খানা করে প্রদীপ নদীতে ভাসানো শুরু হয়েছে। পাড়ে কোথাও গঙ্গারতি শুরু হয়েছে। তার শব্দ শোনা যায়। ভাসতে ভাসতে দ্রুত চলে যাওয়া প্রদীপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনীশ এক সময় জানতে চায়—হৃষীকেশে তোমার মেয়াদ কতদিন? আর কদিন আছ এখানে?

এক ফুৎকারে অরুন্ধতীর মুখের আলো নিভে যায়। হঠাৎই বড্ড ক্লান্ত লাগে ওকে। নিস্তেজ কথা শোনা যায় তার। – –এখানে থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এখানে থাকার কথা মাত্র একদিনই ছিল। ভাগ্যের জোরে আরও একদিন বেড়ে গেছিল। তাই তো তোমার সঙ্গে এমন ভাবে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তবে কাল সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই আমরা রওনা দেব।

—কোথায় যাবে?

—আপাতত চামোলি। চামোলি এবং আশপাশের কটা জায়গায় ছেলেকে নিয়ে যাব। আজ ২৭ তারিখ, ৫ই এপ্রিল ছেলের স্কুল খুলবে। কিন্তু, বিশ্বাস করো অনীশ, হৃষীকেশ ছেড়ে আমার আর কোথাও যেতে মন সায় দিচ্ছে না। এখানে যে তুমি আছ।

অরুন্ধতীর কথায় অনীশ খুব বিচলিত বোধ করে। সে অরুন্ধতীর একটা হাত নিজের দুহাতের মধ্যে তুলে নেয়। —মনকে শান্ত করো, অরু। আমাদের যে যেতেই হবে। দুজনের পথ যে আলাদা, বরং এই ভাল হল। এই হঠাৎ দেখা। এতগুলো বছর পরে দুজনের কাছে দুজনের মন পরিষ্কার হয়ে গেল। যা বুকের গভীরে রত্ন ভাণ্ডার হয়ে গোপনে ছিল, তার হঠাৎ সন্ধান পেলাম আমরা। এ তো কম লাভ নয়, অরু।

অরুন্ধতী কথা বলে না। দুটো চোখ তার জলে ভরে যায়।

—অরু, স্মৃতি সতত সুখের। সে অতীত বলেই। বর্তমান কিন্তু বড় নিষ্ঠুর। তবে আজকের হঠাৎ দেখায় জীবনের নতুন সঞ্চয় যা জুটল তা আমাদের মধুর স্মৃতিতে নতুন সংযোজন হবে। চলো, ওঠো। বরং যেতে যেতে আমরা সেই গানটা গাইবার চেষ্টা করি।

—কোন গানটা? অরুন্ধতীর গলায় বিষাদ।

—সেই যে গো, ভরা থাক স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।

অনীশ হাত বাড়িয়ে দেয়। ম্লান হেসে সেই হাত ধরে অরুন্ধতী নিজেকে টেনে দাঁড় করায়। —চলো।

কয়েক পা এগিয়ে অরুন্ধতী বলে, তুমি ঠিক বলেছ অনীশ। স্মৃতি কখনও কখনও বেদনার হলেও শেষ পর্যন্ত তা সুখের এবং আনন্দের সঞ্চয় হয়ে দাঁড়ায়। জীবনে কিছুই শূন্য হয়ে যায় না। এ কথা আজ নতুন করে বুঝলাম। কিন্তু অনীশ, অরুন্ধতী হঠাৎ বড় দুর্বল হয়ে পড়ে, তোমার সঙ্গে আমার আর কি দেখা হবে না?

হাতে ধরা অরুন্ধতীর হাতে একটু চাপ দেয় অনীশ। —কী বলি তোমাকে? আমি নিজেও তো একই উত্তর খুঁজছি। পৃথিবীতে এমন লক্ষ-কোটি প্রেম স্মৃতিতেই শুধু বেঁচে থাকে। আমাদেরও তাই থাকবে। আমরা আজ নতুন করে অনুভব করেছি প্রেম অবিনশ্বর —হৃদয়ের সংগোপনে সে ঠিক অটুট থাকে। আমাদের আর দেখা না-ই বা হল।

ঘাট রোড এসে গিয়েছিল। —চল অরু, তোমাকে তোমার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মানা করে অরুন্ধতী। কী হবে বেদনাকে দীর্ঘ করে।

সে একটা অটোতে উঠে বসে। অটো ছাড়বার আগের মুহূর্তে হঠাৎ অরুন্ধতী অনীশের হাত চেপে ধরে। —তোমরা আর কতদিন এখানে থাকবে?

—ঠিক নেই কিছু। দু-একদিনও হতে পারে। আবার বেশিও হতে পারে। আমার এক বন্ধু সস্ত্রীক আসবে। তাদের জন্য অপেক্ষা আর কী! ওরা এলে এক-দু দিনের জন্য মুসৌরি যাব। ব্যাস, তারপর ঘরের ছেলে ঘরে।

চশমার আড়াল থেকে ভারী চোখ দুটো তুলে অরুন্ধতী অনীশের দিকে চায়। —একটা অনুরোধ, অনীশ। এপ্রিলের প্রথম দুদিন, না হোক মার্চ মাসের শেষ দিনটি পর্যন্ত পারলে এখানে থেকো। মাত্র তো কটা দিন। আমরা এর মধ্যেই পাহাড় থেকে নেমে আসব। নিশ্চয় আসব। তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে হৃষীকেশের সুন্দর ওই গঙ্গাঘাটেই। কথা দাও, কথা দাও অনীশ, এখানে থাকবে এ কটা দিন।

অনীশ মাথা নাড়তেই অরুন্ধতীর অটো হুশ করে উড়ে যায়।

অরুন্ধতী চলে যাবার পরও অনীশ হরিদ্বার রোডের বাঁধানো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকে। অতীতের দিকে নজর ফেরাতেই বারবার ওর নিজেকে দোষী মনে হতে থাকে। ওদের ভালবাসার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। কিন্তু এ জন্য তো সেই দায়ী। তার আর অরুন্ধতীর মধ্যে দেখাদেখি বন্ধ হবার মূলে অরুন্ধতীর মা একলা দায়ী ছিলেন না, এ জন্য অনীশ নিজেও কম দায়ী ছিল না। পড়াশোনায় ভাল বলে পাড়ার অনেকের কাছেই সে ছিল প্রিয়। তাই সে চেষ্টা করলেই অরুন্ধতীর সঙ্গে দেখা করতে পারত। অবশ্য ওদের বাড়ির সঙ্গে অরুন্ধতীদের পরিবারের বিশেষ লেনদেন ছিল না। যাতায়াত, কথাবার্তাও তাই। দুটি পরিবারের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানে দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু গোবনের বোন আনু ওকে সাহায্য করার ইঙ্গিত দিয়েছিল। চক্রবর্তী বাড়ির গিন্নী, পাড়ার সকলের মাসীমাও তাকে সাহায্য করতেন। কিন্তু অনীশ এগিয়ে যায়নি আর। ও যে তখন হিসেব করছিল —ক্যারিয়ার গড়ার হিসাব। এই হিসাবে স্বপ্নের মেয়ে হলেও এক ফুৎকারে অরুন্ধতীর উড়ে যাওয়া আটকায়নি।

আজ এতদিন পরে অরুন্ধতীকে দেখে, ওর কথা শুনে অনীশের মনে হয় সে মস্ত ভুল করেছে। জীবনের হিসাব সে মেলাতে পারেনি কোনও ভাবেই। ভীষণ আফসোস হতে লাগল ওর। স্থির করল অরুন্ধতীদের ফেরার অপেক্ষায় সে থাকবে। ওর সঙ্গে আর একবার দেখা করে নিজের ভুলের জন্য মাফটুকু চেয়ে নেবে।

পরের দিনটা হরিদ্বারে কাটিয়ে সন্ধ্যার পরে অনীশরা ফিরে এল হৃষীকেশে। বন্ধুর সংবাদ আসেনি কিছু। ছেলে মেয়ের দাবিতে তারও পরের দিন অর্থাৎ ২৯ শে মার্চ যাবার কথা দেবপ্রয়াগ। ওই পথ ধরেই অরুন্ধতীরা চামোলি গিয়েছে। কিন্তু মাঝরাতেই অনীশদের সবাইকে রাস্তায় নেমে আসতে হল। ভূমিকম্পের এক ঝটকায় পৃথিবী দুলছে, মাটি ফাটছে, ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, বিত্ত-বৈভব, মানুষের রাগ-অভিমান-ভালবাসা সব ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

সকাল হতেই অনীশরা সেই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ শুনল। রিখ্‌টার স্কেলে প্রায় সাত কম্পন মাত্রার এক ভূমিকম্প গাড়োয়াল হিমালয়কেগত রাতে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। হৃষীকেশ

অঞ্চলে কোনও ক্ষতি না হলেও চামোলি ও রুদ্রপ্রয়াগের দারুণ ক্ষতি হয়েছে। অনেক লোক নাকি এই দুই জেলায় মারা গিয়েছে। আহতের সংখ্যা আরও বেশি।

খবরটা শুনেই অনীশ প্রথমটা স্থাণু-হয়ে গেল। ওর ভাবনা চিন্তাগুলো সব যেন ভূকম্পের প্রচন্ড আক্ষেপের মধ্যে পড়ে গেছে। ও এখন কী করবে! অরুন্ধতীর খবর কী! সে কেমন আছে কে জানে!

পাগলের মতো অনীশ ছুটল এক সরকারি অফিস থেকে অন্য সরকারি অফিসে, থানায়, বাস স্ট্যান্ডে, অন্য অন্য জায়গায় যেখানে চামোলির কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। কোথাও কোনও খবর নেই। এটুকু শুধু জানা গেছে গতরাতের ভূমিকম্পে চামোলি আর রুদ্রপ্রয়াগে মৃতের সংখ্যা এর মধ্যেই দেড়শ ছাড়িয়ে গেছে, আহত হয়েছে কয়েক শ'র কম নয়। দুটো সংখ্যাই নাকি আরও বাড়বে।

অনীশ ছুটল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। চামোলি যাবে কোনও গাড়ি? জানা উত্তরটাই শুনল। ওদিকে বাস-ট্যাক্সি-প্রাইভেট কোনও গাড়ি যাচ্ছে না —রাস্তায় অনেক জায়গায় ধস নেমেছে।

পরের দিন অবশ্য হতাহতের একটা প্রাথমিক তালিকা হৃষীকেশে পৌঁছে গেল। থানায় গিয়ে সে লিস্ট অনীশ দেখল। মৃতদের মধ্যে একটি বাঙালি মেয়ের নাম —অঞ্জনা মুখার্জি। অঞ্জনাই কি অরুন্ধতী? অনীশের বুকে প্রবল সাইক্লোন আছড়ে পড়ে। সে অরুন্ধতীর অন্য নাম জানে না। স্বামীর নাম বা পদবীও জানে না। আহতের তালিকায় দ্রুত চোখ বোলায় অনীশ। দুটি পুরুষের নাম মুখার্জি পদবীধারী। না না, এ হতে পারে না। এরা অন্য লোক, নিশ্চয় অন্য লোক। অরুন্ধতী কিছুতেই অঞ্জনা হতে পারে না।

উদভ্রান্তের মতো অনীশ ছুটল গঙ্গা ঘাটে। ওই তো সেই ফটোর দোকান। এখানেই এত দিন পরে অকস্মাৎ অরুন্ধতীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওই তো সেই খরস্রোতা জলধারা —একই ভাবে বয়ে যাচ্ছে। এই তো সেই জায়গাটা। জলের এত কাছাকাছি এখানেই ওরা দুজনে বসেছিল। সে আর তার মানসী প্রিয়া। এক চৈত্র সন্ধ্যায় মুখোমুখি হয়ে ওরা ওদের অতীতকে তুলে এনেছিল। সব কিছু একই রকম আছে। অরুন্ধতীও নিশ্চয় আছে। ওকে থাকতেই হবে। ও বশিষ্ঠ-পত্নী নয়, সপ্তর্ষির নক্ষত্রও নয়, উত্তর কলকাতার এক এঁদো গলিতে বেড়ে ওঠা আজকের প্রবীণ হিসেবি এক মানুষের ও স্বপ্নের নায়িকা। ওর বিলুপ্তি নেই, ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই। দেহাতীত আত্মার মতো অনীশের কাছে ও অবিনশ্বর এক স্মৃতিময় সত্তা।

জলের দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ বসে থাকে অনীশ। ওর মন শান্ত হয়ে আসে।